

আল্লামা সাঈদী

একটি সোনালি ইতিহাস

এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ



আল্লামা সাঈদী একটি সোনালি ইতিহাস

এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ



আল্লামা সাঈদী একটি সোনালি ইতিহাস

এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ

তাকহীম পাবলিকেশন

০১৩০৫-৯৬৫৭২০

fb/তাকহীম পাবলিকেশন

tafheempubs@gmail.com

১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

২য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৩য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৪র্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৫ম মুদ্রণ : মে, ২০২৪

৬ষ্ঠ মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০২৪

৭ম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৫

স্বত্ব : লেখক

সম্পাদনা : মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

প্রকাশনাক্রম : ০৪

মূল্য : ২৮০/- (দুইশত আশি টাকা)



প্রকাশকের কথা

আব্দুলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) ছিলেন এক অনন্য মানুষ, অনুপম ব্যক্তিত্ব। দ্বীনের সমঝ ও যথোপযুক্ত উপস্থাপনে তিনি ছিলেন অনন্য। আদর্শের প্রতি কমিটমেন্টে তিনি ছিলেন প্রথম কাতারের সেনাপতি। সাহস, ত্যাগ-কুরবানি, ব্যক্তিত্ব ও রুচিশীলতায় তিনি অগ্রগামীদের অন্যতম। এককথায় বাংলার জমিনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ দাঈ ইলাল্লাহ, সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, প্রাথমিক সংগঠক ও জননন্দিত জননেতা।

আব্দুলামা সাঈদী (রাহি.) যে অপরিমেয় প্রেরণা, আদর্শ, কুরবানি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সে ঋণ অপরিশোধযোগ্য। তাঁকে যথার্থভাবে স্মরণ, অনুসরণ ও দু'আর মাধ্যমেই কেবল সেই ঋণের সহস্রভাগের একভাগ বা তারও কম হয়তো ঘুচতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যয় হোক—আব্দুলামা সাঈদীর জীবন, কর্ম ও আদর্শের বার্তাকে আমরা ছড়িয়ে দেবো সবুজ বাংলাদেশে।

আব্দুলামা সাঈদী (রাহি.)-এর স্মরণে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-য় ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি জনাব এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। *আব্দুলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.)* : একটি সোনালি ইতিহাস শিরোনামের লেখাটি পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার সময় আমরা পাঠকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ পেতে থাকি যে, লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করা হোক। পাঠকের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বক্ষমাণ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

প্রকাশের পরপরই বইটি পাঠকসমাজে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা—বইটির মাধ্যমে আব্দুলামা সাঈদী (রাহি.)-এর জীবন, কর্ম, অবদান ও আদর্শ সম্পর্কে বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের মানুষেরা জানবে। তারা আব্দুলামা সাঈদীর জীবনকে জানার মাধ্যমে আব্দুল্লাহর দ্বীনের পথে চলতে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হতে প্রেরণা পাবে, ইনশাআল্লাহ।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٢﴾

“মুমিনদের মধ্যে একদল বান্দা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ শাহাদাতের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (দ্বীনের পথে) তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি।” সূরা আহযাব : ২৩





সূচিপত্র

আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	০৭
ভূমিকা	১১
১. প্রথম যেদিন তাঁকে দেখি	১৫
২. তাফসিরের ময়দানে নির্ভীক সেনাপতি	১৮
৩. আদর্শ মানুষ, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব	২৩
৪. অকুতোভয় দাঈ ইল্লাহ	২৫
৫. তাফসিরের মাঠে নতুন ধারার প্রবর্তক	২৮
৬. প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ	৩০
৭. জননন্দিত জননেতা	৩৪
৮. ঘোঁসের একনিষ্ঠ খাদেম	৩৮
৯. কারাবরণ	৪০
১০. শ্বাসরুদ্ধকর একটি দিন	৪৩
১১. কারাগারে পেলাম একান্ত আপনজনদের	৪৬
১২. আল্লামার সান্নিধ্যে কারাযাপনের স্মৃতি	৫০
১৩. কারাগারেও সুবাস ছড়ায় যে ফুল	৫৪
১৪. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দারসে হাদিস	৫৭
১৫. তাহাজ্জুদের এক জান্নাতি পরিবেশ	৬১
১৬. আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা	৬৫
১৭. আল্লাহর ঘর ও রাসূল সা.-এর রওজার প্রতি আবেগ	৭৪

১৮. ইসলাম, দেশপ্রেম ও জাতির স্বার্থরক্ষাই তাঁদের অপরাধ	৮৪
১৯. বিচারের নামে অবিচার	৯২
২০. আটাশ ফেক্সারির গণহত্যা	১০৩
২১. বেকসুর খালাসের রায় দিলেন যে বিচারপতি	১১১
২২. বেদনাবিধুর কারাজীবন	১১৫
২৩. মমতাময়ী জননীর জানাযায়	১২০
২৪. নিভে গেল কুরআনের আলো বিলানো এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ	১৩১
২৫. জানাযায় জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার	১৪৪
২৬. গায়েবানা জানাযায় বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা	১৪৮
২৭. স্যোশাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশেও বর্বর হস্তক্ষেপ	১৫৬
২৮. আল্লামা সাঈদীর অবদান	১৬৩
পরিশেষে...	১৭৪

আব্বাস সাঈদী (রাহি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ১৯৪০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী গ্রামে আব্বাস দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জন্মগ্রহণ করেন।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-সাইদখালি, ইউনিয়ন-বালিপাড়া, উপজেলা-ইন্দুরকানী, জেলা-পিরোজপুর।

জীবনকাল : ১৯৪০-২০২৩ সাল। জীবনকালের হিসেবে তিনি দেখেছেন ব্রিটিশ শাসনামল (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত), পাকিস্তান শাসনামল (১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত) এবং বাংলাদেশ আমল।

পিতার নাম : ইউসুফ সাঈদী; তিনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম ছিলেন।

মায়ের নাম : গুলনাহার বেগম।

স্ত্রী : সালেহা বেগম।

সন্তান : চার পুত্র—মরহুম রফিক সাঈদী, শামীম সাঈদী, মাসুদ সাঈদী ও নাসিম সাঈদী।

শিক্ষা জীবন : পিতা ইউসুফ সাঈদীর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর খুলনা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। ১৯৬২ সালে ছারছিনা আলিয়া মাদরাসা থেকে পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। ভাষা, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মনোবিজ্ঞান ও বিভিন্ন তত্ত্বের ওপর দীর্ঘ পাঁচ বছর নিবিড় অধ্যয়ন করেন। বাংলার পাশাপাশি তিনি উর্দু, আরবি ও পাঞ্জাবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন; ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাও আয়ত্ত্ব করেছিলেন।

দাঈ ইলাহিয়াহ : আব্বাস সাঈদী ১৯৬৭ সাল থেকে ওয়াজ মাহফিল ও তাফসিরুল কুরআন মাহফিলের মাধ্যমে দাওয়াতে ধ্বনির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সময়ের পরিক্রমায় ১৯৭৩ সালে ঐতিহাসিক আরমানিটোলা ময়দানে

অনুষ্ঠিত মাহফিলে আল্লামা সাঈদী আঞ্চলিক বক্তা থেকে জাতীয় পর্যায়ে বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বিগত ৫০ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া ও কুমিল্লাসহ সারাদেশে অসংখ্য তাফসির মাহফিল করেছেন। স্বদেশের বাইরেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধশত দেশে তিনি কুরআনের তাফসির পেশ করেছেন।

সাংগঠনিক জীবন : আল্লামা সাঈদী ১৯৭৩ সালে সহযোগী সদস্য হিসেবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জামায়াতের রুকন হন। ১৯৮৯ সালে মজলিশে শূরা সদস্য এবং ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মনোনীত হন। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট ওফাতের আগপর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীরের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন তিনি।

রাজনৈতিক জীবন : আল্লামা সাঈদী একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, দাঈ ও সুবক্তা হওয়ার পাশাপাশি দক্ষ ও জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি পিরোজপুর-১ আসন থেকে দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একজন সংসদ সদস্য হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

লেখালিখি : আল্লামা সাঈদী নিয়মিত লেখালিখি করতেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ৭৫টি প্রায়। তাফসীরে সাঈদী, সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন, আখিরাতের জীবনচিত্র, পবিত্র কোরআনের মুজিজা, ইমানের অগ্নিপরীক্ষা, আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি, দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি, চরিত্র গঠনে নামাযের অবদান, নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে : আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আল্লামা সাঈদীর ছিল সরব বিচরণ। কুরআনের তাফসির পেশ, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় ও বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থার আমন্ত্রণে তিনি প্রায় ৫০টি দেশে সফর করেন।

১৯৭৬-২০১০ সাল পর্যন্ত সৌদি বাদশার আমন্ত্রণে রাজকীয় মেহমান হিসেবে পবিত্র হজব্রত পালন করেছেন।

১৯৯০-২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতি রমজান মাস মক্কা-মদিনায় অবস্থান করে ইতিকাফ করেছেন।

১৯৮২ সালে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনির আমন্ত্রণে তেহরান সফর করেন।

১৯৯১ সালে সৌদি বাদশার আমন্ত্রণে কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের মীমাংসা বৈঠকে যোগদান করেন।

১৯৯১ সালে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা কর্তৃক ‘আল্লামা’ উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে আমেরিকান মুসলিম ডে প্যারেড সম্মেলনে আল্লামা সাঈদীকে ‘গ্র্যান্ডমার্শাল’ পদক দেওয়া হয়।

২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর দুবাই সরকারের আমন্ত্রণে আরব আমিরাতে অর্ধ লক্ষাধিক শ্রোতার সামনে তিনি কুরআনের তাফসির পেশ করেন।

২০০৪ সালে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন কাবা শরিফের সম্মানিত ইমাম শাইখ আবদুর রহমান আস সুদাইস।

আল্লামা সাঈদীর প্রিয় অনুষঙ্গ

স্মরণীয় মুহূর্ত : প্রথম কাবা দর্শন।

কামনা : শাহাদাতের মৃত্যু।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহি.)।

বক্তা : শাইখ আবদুল হামিদ কিশক, আহমদ দিদাত, ডা. জাকির নায়েক।

লেখক : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, হাসান আল বান্না, ড. মুরিস বুকাইলি, মাওলানা আবদুর রহীম।

কবি : শেখ সাদি, উমর খৈয়াম, ড. ইকবাল, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, মতিউর রহমান মল্লিক।

অবসরে : অধ্যয়ন, আত্মীয়-স্বজনদের সান্নিধ্যে সময় কাটানো।

লালিত স্বপ্ন : বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন।

কারাজীবন

প্রথমবার কারাবরণ : ১৯৭৫ সালে প্রথম কারাবরণ করেন।

দ্বিতীয়বার কারাবরণ : ২০১০ সালের ২৯ জুন তথাকথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলায় গ্রেফতার হন তিনি। ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মিথ্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়।

ইন্ডেকাল : আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ২০২৩ সালের ১৩ আগস্ট কাশিমপুর কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে তাঁকে গাজীপুরে শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা বিএসএমএমইউ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরের দিন ১৪ আগস্ট বিএসএমএমইউ (পিজি) হাসপাতালে তিনি ইন্ডেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৪ বছর।

জানাযা ও দাফন : ১৫ আগস্ট, মঙ্গলবার বেলা ০১ টা ১০ মিনিটে পিরোজপুর আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন মাঠে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। পিরোজপুরের মাছিমপুরে বায়তুল হামদ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পারিবারিক কবরস্থানে বড়ো ছেলের কবরের পাশে আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-কে দাফন করা হয়।

ভূমিকা

১৪ আগস্ট, ২০২৩-এর সন্ধ্যা। সাড়ে সাতটায় কেন্দ্রীয় ইউনিটের বৈঠক চলছিল। বৈঠক চলাকালে আমরা ভূমিকম্প অনুভব করি। তাড়াতাড়ি বৈঠক শেষ করে ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সেলফোন হাতে নিলে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.)-এর মৃত্যু-সংবাদ চোখে পড়ে। এর মধ্যে মাওলানা আবদুল হালিম ভাই জানালেন, আল্লামা সাঈদী সাহেব আর আমাদের মাঝে নেই (ইল্লা লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন)। সংবাদটি পেয়ে নিজেদের অজান্তেই আমরা সকলে অশ্রুধারায় ভরে পড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনেকেই সংবাদে সত্যতা জানার জন্য কল করতে থাকেন। কেউ যেন বিশ্বাস করতেই পারছেন না। আগের দিন যে প্রিয় মানুষটিকে অমলিন হাসিমুখে মিডিয়ায় দেখতে পেয়েছেন, তিনি আজ দুনিয়ার সফর শেষ করে সবাইকে কাঁদিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। সবার মনে এক দুর্নিবার আশা ছিল—আল্লামা সাঈদী আবার কুরআনের ময়দানে ফিরে আসবেন এবং কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। শোকাহত জনতা বিএসএমএমইউ হাসপাতালের সামনে জমায়েত হতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দসহ আমিও সেখানে ছুটে যাই। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, হাজার হাজার মানুষের কান্নার আওয়াজ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। হাসপাতালের রোগী ও তাদের স্বজনরাও অশ্রুধারায় চোখে শরিক হয় শোকাহত জনতার সারিতে। রাত যতই গভীর হচ্ছিল, বিভিন্ন দিক থেকে হাজার হাজার শোকাহত মানুষ ছুটে আসছিল। তাদের আকৃতি ছিল—প্রিয় মানুষটিকে একনজর দেখবে এবং জানাযার নামাজ আদায় ও দুআ করে শেষ বিদায় জানাবে। মানুষের এটুকু

আরজি বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বারবার অনুরোধ করা হতে থাকে। কিন্তু তারা মাইয়েতের প্রতি জনতার শ্রদ্ধা জানানোর মানবিক অধিকার এবং জানাযা পড়ার ধর্মীয় অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে ইতস্তত করল না। কোনো অনুরোধ, যোগাযোগ ও আলাপেই তারা রাজি হলো না। সরকারের অন্যায় নির্দেশে প্রশাসন জানাযার নামাজ তো পড়তে দেয়ইনি; বরং টিয়ার গ্যাস, বুলেট ও সাউন্ড থেনেড ছুড়ে জনগণকে হটিয়ে ইতিহাসের একটি বর্বরতম নজির স্থাপন করে।

সেদিন এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ ও ভীতিকর পরিবেশেও হাসপাতাল চত্বরে তাৎক্ষণিকভাবে অগণিত মানুষের উপস্থিতি দেখে বোঝা যায়, মানুষ আব্বাস সাঈদীকে ভালোবাসে কুরআনের জন্য, আব্বাহর জন্য। দল-মত নির্বিশেষে কুরআনপ্রেমী জনতার এই ভালোবাসা ও দরদ সবাইকে বেদনাকাতর করেছে; কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার তা বুঝতে পারল না।

আব্বাস দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দেশ-বিদেশে সকলের মুখে একটি কথা উচ্চারিত হয়েছে— আব্বাস সাঈদী ইতিহাসের এক কিংবদন্তির নাম। তিনি বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, জনপ্রিয় পার্লামেন্টারিয়ান, আদর্শ মানুষ ও কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বীরসেনানী।

আব্বাস সাঈদী (রাহি.) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন কণ্ঠ ও জনপ্রিয় জননেতা হিসেবে অবদান রেখেছেন, তেমনি তিনি একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও অত্যন্ত সং, তাকওয়াবান, বিনয়ী ও সৌজন্যবোধের অধিকারী আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছেন। তাঁর সন্তানদের মুখে পিতার নৈতিকতা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার কথা শুনে আমরা অভিভূত হই। পরিবারের সদস্যদের মাঝে তিনি সুন্দর জীবন উপস্থাপনের মাধ্যমে যে মডেল স্থাপন করেছিলেন, তা আমাদের সকলের জন্য অনুসরণীয়। আব্বাস সাঈদী তাঁর আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুমহলে একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সংগঠনের অভ্যন্তরে, রাজনৈতিক ময়দানে, জনগণের মাঝে ও পার্লামেন্টে আব্বাস সাঈদী (রাহি.) একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং মহান নেতা ছিলেন।

তিনি যুগ-সচেতনতা, বিস্ময়কর বাগিতা, কুরআন-সুন্নাহর ভারসাম্যপূর্ণ সমঝ, উম্মাহচেতনা ইত্যাদি বহুবিধ দিক থেকে আলেমসমাজের মাঝেও ছিলেন নক্ষত্রতুল্য। আল কুরআন ও আল হাদিসের শিক্ষাকে তিনি শিক্ষিত শ্রেণি থেকে শুরু করে সাধারণ জনতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। ইসলামের আলোকরশ্মিকে তিনি ছড়িয়েছেন সর্বত্র। আল্লামা সাঈদী (রাহি.) নিজেকে যেভাবে এক মহান ব্যক্তিত্ব রূপে গড়ে তুলেছিলেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। আল্লামা সাঈদী শুধু বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ ছিলেন তা নয়; বরং তিনি উম্মাহর সম্পদ ছিলেন।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর বর্ণাঢ্য জীবন, কর্ম, অবদান ও ত্যাগ-কুরবানি নিয়ে অনাগত দিনে অনেক গবেষক গবেষণা করবেন এবং অনেক লেখক লিখবেন, ইনশাআল্লাহ। আমি তাঁর একজন গুণমুগ্ধ অনুজ সহকর্মী হিসেবে স্মৃতিসাগরের বেলাভূমি থেকে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি মাত্র।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.)-এর ইন্তেকালের পর ওনার বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে লেখার জন্য সাপ্তাহিক সোনার বাংলা-র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অধ্যাপক তাসনীম আলম আমাকে অনুরোধ করেন। তখন আল্লামা সাঈদীর প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে ওনার গুণগ্রাহীদের অনুপ্রাণিত করা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে লেখার জন্য মনস্থির করি। লেখাটি শুরু করার পর ভেবেছিলাম এক পর্বেই তা শেষ করব। কিন্তু আল্লামা সাঈদীর বর্ণাঢ্য জীবন ও তাঁর সাথে আমার জীবনের অনেক স্মৃতিময় ঘটনা তখন সামনে চলে আসে। ফলে কলবর বৃদ্ধি পাওয়ায় লেখাটি সোনার বাংলা-য় কয়েকটি পর্বে ছাপানো হয়। এর মধ্যে সোনার বাংলা অফিস থেকে আমাকে জানানো হয়, আল্লামা সাঈদীর ওপর আপনার লেখাগুলো একটি বই আকারে প্রকাশের জন্য পাঠকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসছে। তখন আরও কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে লেখাটি অব্যাহত রাখি। অবশেষে পনেরো পর্বে লেখার ইতি টানা হলো। পরবর্তী সময়ে বই আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে আরও কিছু প্রসঙ্গ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বইটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন পোর্টাল, ইউটিউব চ্যানেলে আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সেমিনারের আলোচনা এবং ওনার ওপর রচিত বই ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

বইটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সোনার বাংলা-র বার্তা সম্পাদক ফেরদৌস আহমদ, সিনিয়র রিপোর্টার হারুন ইবনে শাহাদাত, আল্লামা সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী, আল্লামার ব্যক্তিগত সচিব রাফে সামনান ও লেখক শামিমুল বারীর কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। বইটি লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন নাইম সিদ্দিকী ও ফজলুর রহমান। তাক্বীম পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে রাজিফুল হাসান ও তারিক মাহমুদ আন্তরিক আগ্রহের সাথে এ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানের সম্পাদনা ও হাশেম আলীর প্রচ্ছদ বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে বইটিতে কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠকবর্গের পরামর্শ আশা করছি।

বইটি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে তারা যদি উপকৃত হন, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে তৃপ্তিবোধ করব।

এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ

২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

ঢাকা

১. প্রথম যেদিন তাঁকে দেখি

আল্লামা সাঈদীকে আমার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয় ১৯৭৮ সালে। তখন আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী। লেখাপড়ার সুবাদে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার একটি গ্রামে থাকি। ওই বছর লোহাগাড়া উপজেলায় চুনতির সিরাতুল্লবী সা. মাহফিলে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আসার কথা শুনে গ্রামের ছাত্র-জনতার মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে গ্রামের কয়েকজন মুরবির সাথে মাহফিলে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিলাম। মাহফিলের দিন সকালবেলা আমরা বাঁশখালীর দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরে পায়ে হেঁটে রওনা দিই। সেই পাহাড়ি পথ ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি সেখানে কোনো কোনো সময় বন্যপ্রাণীর আক্রমণও হয়ে থাকে। এ ঝুঁকি উপেক্ষা করে আল্লামা সাঈদীর মাহফিল শোনার জন্য মানুষ পঙ্গপালের মতো ছুটে চলেছে। সাঈদী সাহেবের আলোচনার সময় নির্ধারিত ছিল সন্ধ্যার পর। কিন্তু বেলা ডোবার পূর্বেই মাহফিলস্থল ছাড়িয়ে আশপাশের এলাকাও লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর যথারীতি মাহফিল শুরু হয়। মধ্যে দেশবরেণ্য অনেক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পরপরই আল্লামা সাঈদী মধ্যে আসেন। তিনি মধ্যে উঠার সাথে সাথে উপস্থিত শ্রোতার চতুর্দিক থেকে তাকবির-ধ্বনি উচ্চারণ করে মুহূর্মুহ শ্রোতান দিতে থাকে। তখন সমগ্র মাহফিলস্থল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভরে উঠে। কিছুক্ষণ পর তিনি বয়ান শুরু করলে সেখানে পিনপতন নীরবতা চলে আসে। উপস্থিত জনতা তন্ময় হয়ে ওনার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনতে থাকে। আল্লামা সাঈদী প্রায় দুই ঘণ্টার মতো আলোচনা করেন। অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত কন্ঠ, চমৎকার উপস্থাপনা এবং কুরআনের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত শ্রোতারা সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তখন থেকেই অনেকের মতো আমার মনের মণিকোঠায় আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্থান করে নেন।

চুনতির মাহফিল থেকে ফিরে এসে আমার তরুণ বয়সের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজাখালী ফাজিল মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে সেই দিনের মাহফিলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। তা শুনে সকলের মধ্যে আল্লামা সাঈদীকে দেখার কৌতূহল জন্ম নেয়। কীভাবে মাদরাসার মাঠে আল্লামা সাঈদীর মাহফিলের আয়োজন করা যায়, সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পরামর্শ করে তাদের কাক্ষিত মেহমানের দাওয়াতের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব প্রদান করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আমি চট্টগ্রাম শহরে এসে চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের তৎকালীন আমীর ও ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (রাহি.)-এর সাথে যোগাযোগ করে আল্লামা সাঈদীর মাহফিলের দিন-তারিখ চূড়ান্ত করি। সুন্দরমতো সে দায়িত্ব আনজাম দিতে পারায় সকলেই খুব আনন্দিত হলেন।

নির্দিষ্ট দিন-তারিখে মাদরাসার মাঠে মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাঠটি ছিল অনেক বিস্তৃত জায়গাজুড়ে বিশাল এক উন্মুক্ত ময়দান। মাহফিলের দিন সকাল থেকে পার্শ্ববর্তী উপজেলাসহ দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে। বেলা ১২টার পূর্বেই মাঠ পূর্ণ হয়ে মাদরাসা ভবনের ছাদ, আশপাশের এলাকা ও রাস্তা-ঘাটে কুরআনশ্রেয়ী জনতার ঢল নামে। কোথাও তিল ধারণের ঠাই নেই। মাঠের বাইরে আশপাশের এলাকাও লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লামা সাঈদী (রাহি.) মাহফিলের দিন বিকাল ৩টায় মঞ্চে আসেন। তখন মুহূর্মুহ স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মঞ্চ থেকে নাম ঘোষণার পর আল্লামা সাঈদী সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। মানুষ অধীর অগ্রহে নীরবে কুরআনের তাকসিরের বয়ান শুনছিল। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নামছিল। তখন মাদরাসার দালানের ছাদের ওপর থেকে লোকজন তাড়াহুড়া করে নামার চেষ্টা করছিল। এ সময় বক্তার আসন থেকে আল্লামা সাঈদী শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন—‘ভাইয়েরা আমার, বৃষ্টি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব না রহমত?’ তখন উপস্থিত লাখ লাখ জনতা সমন্বরে বলে উঠল—‘রহমত।’ তখন তিনি বললেন—‘তাহলে সবাই বসুন।’ এ কথা বলার সাথে সাথে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়ে। অতঃপর তিনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ যিকির শুরু করেন। তাঁর সাথে লাখো শ্রোতার সম্মিলিত যিকিরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় বৃষ্টি থেমে গেলে তিনি দীর্ঘ

সময় ধরে কুরআনের তাফসির করেন। এতে দূরদূরান্ত থেকে আসা বৃষ্টিভেজা মানুষের হৃদয়-মন জুড়িয়ে যায়। এভাবে তিনি বিভিন্ন মাহফিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এক্ষেত্রে শ্রোতাদের মনে কুরআনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাশাপাশি আল্লামা সাঈদীর প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার হতো এবং মানুষের ওপর উনার ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় প্রভাব পড়ত।

২. তাফসিরের ময়দানে নির্ভীক সেনাপতি

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) চট্টগ্রাম শহরে প্রতি বছর টানা পাঁচ দিন করে কুরআনের তাফসির করতেন। প্রথমদিকে চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল হাইস্কুল মাঠ, এরপর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাইস্কুল মাঠে তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। পরে তা প্যারেড ময়দানে স্থানান্তর হয়। লাখে জনতার সম্মিলন এ তাফসিরুল কুরআন মাহফিলে পবিত্র কাবা শরিফের সম্মানিত ইমাম দুবার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের তৎকালীন সেনানিবাসের জিওসি ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল এম নুরুদ্দীন খান সাহেবকেও স্টেজে বসে ওনার বক্তব্য শুনতে দেখেছি; তিনি অবসরে যাওয়ার পর জাতীয় সংসদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের এই ঐতিহাসিক তাফসিরুল কুরআন মাহফিলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষক, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ছাত্র, যুবক, মহিলা, হিন্দু-মুসলিম দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ দলে দলে মাহফিলে যোগদান করত। আমরাও রাজাখালী ফাজিল মাদরাসা থেকে শিক্ষক ও ছাত্ররা চট্টগ্রাম শহরের উক্ত মাহফিলে প্রতি বছর দলবেধে অংশগ্রহণ করতাম। মাহফিলের মাঠে বিশাল প্যাভেলের নিচে সুশৃঙ্খলভাবে মানুষ অবস্থান করত। কোথাও তিল ধারণের ঠাই থাকত না। আশপাশের রাস্তাঘাট, দালানের ছাদ এমনকি গাছে উঠে লোকজন মাহফিলের বয়ান শুনত। সকলের একনিষ্ঠ দৃষ্টি থাকত স্টেজে উপবিষ্ট আল্লামা সাঈদীর দিকে। চট্টগ্রামের প্রতিটি সড়ক মুখরিত হতো ‘আল কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো’ স্লোগানে। পুরো চট্টগ্রাম উৎসব ও উচ্ছ্বাসের নগরীতে পরিণত হতো। ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ এই ঐতিহাসিক তাফসির মাহফিলের আয়োজন করত।

১৯৮৩ সালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হই। সে সময়ে দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীগণ মাহফিলে অংশগ্রহণ করতেন। আমিও প্রতি বছর এ তাফসির মাহফিলে যোগদান করে বেশ অনুপ্রেরণা লাভ করতাম। এককথায় এই মাহফিল ছিল কুরআনপ্রেমীদের বার্ষিক একটি মিলনমেলার মতো।

লাখ লাখ মানুষের সমাগমের পরও এই মাহফিল ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। পিনপতন নীরবতায় মানুষ কুরআনের তাফসির শুনত। আবার কখনও কখনও মনের আবেগে বিভিন্ন স্লোগানে আলোড়িত করত সমগ্র ময়দান। এভাবে কুরআনের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আল্লামা সাঈদীর প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অন্তরের গভীরে স্থান করে নেয়। তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। মাহফিলে যারা অংশগ্রহণ করতে পারতেন না, তারা মাহফিলের অডিও-ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করে কুরআনের তাফসির শুনতেন। কুরআনের তাফসিরের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদী দ্বীনের দাওয়াত প্রসারের জন্য বিশাল কাজ করে গেছেন। ওনার তাফসির শুনে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-যুবক অন্ধকার জীবন ছেড়ে আলোর পথে আসার এবং ইসলামের আলোকে জীবন গড়ার প্রেরণা লাভ করে। অনেক অমুসলিমও ওনার হাতে কালেমা শাহাদাত পড়ে ইসলামের পতাকাতলে আসার সৌভাগ্য অর্জন করে।

ইসলামের এ অগ্রযাত্রা দেখে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো এই সুন্দর ও সুশৃঙ্খল মাহফিল বন্ধ করার অপচেষ্টা চালায়। চট্টগ্রামে তারা হরতাল ডেকে মাহফিল বন্ধ করার জন্য উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করে। ফলে প্রশাসন কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে মাহফিলের অনুমতি বাতিল করে দেয়। এর বিরুদ্ধে কুরআনপ্রেমী মানুষ রাস্তায় নেমে তীব্র প্রতিবাদ জানালে প্রশাসন চট্টগ্রাম কলেজ সংলগ্ন প্যারেড ময়দানে মাহফিলের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক প্যারেড ময়দান কলেজিয়েট স্কুলের মাঠের চেয়ে অনেক বড়ো হওয়ায় মাহফিলের শ্রোতাদের জন্য সুবিধা বেড়ে যায়। এদিকে কুরআনের মাহফিলবিরোধীরা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখে এবং মাহফিলের দিন পুনরায় হরতালের ডাক দেয়। ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃপক্ষ হরতালের মধ্যেই প্যারেড ময়দানে পাঁচ দিনব্যাপী মাহফিলের আয়োজন করে। এ মাহফিলের প্রথম দিন সন্ধ্যার পর আল্লামা সাঈদী মঞ্চে উপস্থিত হলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। উপস্থিত লাখে বিক্ষুব্ধ

জনতা মুহম্মুহ স্লোগানে পুরো চট্টগ্রাম নগরী প্রকম্পিত করে তোলে। তখন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) বিস্মুক্ত জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন—

“কুরআনের দুশমনরা তাফসির মাহফিল বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাঁর কিতাবের মাহফিলকে আরও বরকতময় করে দিয়েছেন। তাদের বিরোধিতার কারণে আরও বড়ো মাঠে মাহফিলের আয়োজন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং হরতালে দোকানপাট বন্ধ থাকায় আরও বেশি মানুষ মাহফিলে যোগদান করতে পেরেছে।”

এ জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালায় শুকরিয়া আদায় করেন এবং এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ থেকে সূরা সফ-এর ৮নং আয়াতটি ব্যাখ্যা করে শোনান, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يُرِيدُونَ لِيُظْفَرُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

“তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো, তিনি তাঁর নুরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।” সূরা সফ : ০৮

আল্লামা সাঈদী শুধু চট্টগ্রামে নয়; বরং দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অসংখ্য তাফসির মাহফিল করে অগণিত মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌছিয়েছেন। চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে ২৯ বছর, খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানসহ শহরের বিভিন্ন মাঠে প্রতি বছর ২ দিন করে দীর্ঘ ৩৮ বছর, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে প্রতি বছর ৩ দিন করে ৩৩ বছর, রাজশাহী সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে প্রতি বছর ৩ দিন করে ৩৫ বছর, বগুড়া শহরে প্রতি বছর ২ দিন করে ২৫ বছর, ঢাকার মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ও কমলাপুর রেলওয়ে মাঠ এবং পল্টন ময়দানে প্রতি বছর ৩ দিন করে ৩৪ বছর, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে ৩ দিন করে প্রায় ৩১ বছর যাবৎ আল্লামা সাঈদীর তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি কুরআনের তাফসির মাহফিল করে মুফাসসিরে কুরআন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

তাকসির মাহফিলে আব্দামা সাঈদীর সাহসিকতা

কুরআনের তাকসির মাহফিলের কোনো কোনো স্থানে ইসলামবিরোধী শক্তি সন্ত্রাসী হামলার চেষ্টা চালায়। কিন্তু আব্দামা সাঈদীর সাহসী ভূমিকার কারণে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তারা তাকসির মাহফিল বন্ধ করতে পারেনি।

১৯৯২ সালে রাজধানীর পাছপথে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে সিরাতুল্লাহী (সা.) মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি আ জ ম ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে আব্দামা সাঈদী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন। ওনার বক্তব্য চলাকালীন সময়ে একদল উচ্ছৃংখল যুবক হামলা চালায়। তখন আব্দামা সাঈদী স্টেজ থেকে ‘আব্দাহ্ আকবার’ বলে তাকবির দেন। এই হুংকার শোনে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। মাহফিলের কিছু শ্রোতা আহত হলেও মাহফিল বন্ধ হয়নি।

অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল লক্ষ্মীপুর জেলা শহরের একটি মাহফিলে। সেই মাহফিলে সাবেক সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মাস্টার শফিকুল্লাহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে আব্দামা সাঈদীর বয়ানের একপর্যায়ে ইসলামবিরোধী শক্তি আক্রমণ চালায়। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আয়োজকগণ দ্রুত মাহফিল বন্ধ করার জন্য আব্দামা সাঈদীকে অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের সাহসী সৈনিক আব্দামা সাঈদী শ্রোতাদের সাথে নিয়ে সরবে আব্দাহর কাছে দুআ করেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ .

“হে আব্দাহ, আমরা তোমাকে তাদের মুখোমুখি পেশ করছি, তুমিই তাদের দমন করো। আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছেই আমরা আশ্রয় চাই।”

উপর্যুক্ত দুআ পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এরপরও আব্দামা সাঈদী প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো তাকসির পেশ করেন।

১. এটি মূলত হাদিস শরিফে বর্ণিত একটি দুআ। রাসূলুল্লাহ সা. শত্রুদলের মুখোমুখি হলে এই দুআ পড়তেন। বিশিষ্ট সাহাবি আবু মুসা আশয়ারি রা. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রাহি.) স্বীয় হাদিস সংকলনে (১৫৩৯) হাদিসটি উদ্ধৃত করেন।

—সম্পাদক

এই ঘটনাগুলোর দিকে অন্তর্দৃষ্টির সাথে তাকালে বোঝা যায়—আল্লামা সাঈদী ছিলেন ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও উত্তম আচরণের অধিকারী—যা একজন দাঈর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কাজীকৃত বৈশিষ্ট্য।

চটখামসহ আরও কয়েকটি স্থানে এ ধরনের হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এ সব ঘটনায় আল্লামা সাঈদী কখনও বিচলিত হননি। প্রত্যেকটি ঘটনায় তিনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ এক পরিস্থিতিতে আল্লামা সাঈদী মাহফিলের স্টেজ থেকে আল্লাহ আকবার হংকার দিয়ে বলেছিলেন—

“আমাকে ভয় দেখিয়ে কী লাভ! আমি তো জ্বলন্ত আগুনে নিষ্কিণ্ত সেই ইবরাহিম আ.-এর দুঃসাহসী সন্তান। একমাত্র শাহাদাতের মৃত্যু ছাড়া আল্লাহর কুরআনের ময়দান থেকে দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাকে স্তব্ধ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।”

এভাবে তিনি সর্বদা নিজে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করতেন এবং মানুষকে এ পথে উজ্জীবিত করতেন। বস্তুত কোনো মুমিন যখন অন্তর থেকে শাহাদাতের তামান্না পোষণ করেন, তখন আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তিকে পরোয়া করে না। আল্লামা সাঈদী ছিলেন কুরআনের সেই সাহসী সৈনিক, যিনি জীবনবাজি রেখে নির্ভয়ে মানুষের কাছে সত্যকে তুলে ধরতেন।

৩. আদর্শ মানুষ, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ঢাকার শহীদবাগে নিজ বাসভবনে বসবাস করতেন। ওনার বাসভবনে একসময় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের দায়িত্বশীলদের মেস ছিল। পরবর্তী সময়ে তা পাশের মহল্লা শাহজাহানপুরে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৯৩ সালে আমার ওপর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরীর (দক্ষিণ) সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফলে অনেক স্মৃতিবিজড়িত ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকায় চলে আসতে হয়। পবিত্র রমজান মাসের এক সকালে আল্লামা সাঈদীর তৃতীয় পুত্র মাসুদ সাঈদী মেসে এসে আমাকে জানাল, ‘আব্বা যেকোনো একদিন মহানগরী সভাপতিকে সাথে নিয়ে বাসায় ইফতার করতে চান।’ এ কথা শুনে আমি বেশ আনন্দিত হয়ে দাওয়াত গ্রহণ করলাম। অন্যান্য প্রোগ্রাম রিশিডিউল করে ওনার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে এক দিন পরই দাওয়াতের সময় নির্ধারণ করি।

পরদিন বাদ আসর মহানগরী সেক্রেটারি ডা. এনামুল হক ভাইকে নিয়ে আল্লামার বাসায় গেলাম। বাসায় প্রবেশ করে দেখি, আল্লামা সাঈদী চাদর বিছানো ফ্লোরে সন্তানদের সামনে নিয়ে আলোচনা করছেন। আমরা উপস্থিত হলে তিনি আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে দুআ করলেন। পাশে বসিয়ে কুশলাদি বিনিময়ের পর সংগঠনের খোঁজখবর নিলেন। অতঃপর ইফতারের পূর্বে দুআ শেষে নিজ হাতে আমাদের মেহমানদারি করলেন। ওনাকে বেশিরভাগ সময় দূর থেকে দেখেছি, দু-একবার সাক্ষাৎও হয়েছে। কিন্তু এত কাছে বসে ঘনিষ্ঠভাবে সান্নিধ্য লাভের সুযোগ এর আগে হয়নি। সেদিন ওনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব, সুন্দর ব্যবহার, আন্তরিকতাপূর্ণ আতিথেয়তা, পরিবারের সদস্যদের আদর ও স্নেহের মায়ায় ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার অপূর্ব দৃশ্য আমাদের বিমোহিত করে।

আল্লামা সাঈদীর সাথে সেদিনের একান্ত আলাপচারিতায় জানতে পারি—তিনি আত্মগঠনের পাশাপাশি আদর্শ পরিবার গঠন ও পরিবারে দ্বিনি পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক করেন। বৈঠকে কুরআনের দারস ও পারিবারিক বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। পরিবারের সদস্যগণকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। বৈঠকে পরিবারের মহিলা সদস্যরাও পর্দার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। আল্লামা সাঈদী কুরআন মাজিদের সেই নির্দেশনার পূর্ণ অনুসরণের চেষ্টা করেন, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

﴿১৬﴾...

“হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যে জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।” সূরা তাহরিম : ৬

উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে তিনি তাফসিরের ময়দানে সাধারণ মানুষকে দাওয়াত প্রদানের পাশাপাশি পরিবারকে দাওয়াতের মধ্যে शामिल করতেন। আল্লামা সাঈদীর এই বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, আল্লামা ছিলেন জীবনের সকল স্তরে একজন আদর্শ মানুষ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

৪. অকুতোভয় দাঈ ইল্লাহ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) একজন মর্দে মুমিন ও দ্বীনের পথে অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন। তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে মানুষের কাছে মানবরচিত মতবাদের ব্যর্থতা ও শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন। এজন্য নাস্তিক-মুর্তাদরা তো বটেই, মাজারকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা বিনা পুঁজির বিশাল রমরমা ব্যবসার অংশীদাররাও ওনার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। সেজন্য তাঁর দিকে প্রায় সময় নানান উড়ো হুমকি আসত। কিন্তু তারপরও তিনি নির্ভয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রেখে স্বাভাবিক চলাফেরা করতেন।

১৯৯৮ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর অবিভক্ত সবুজবাগ থানার দায়িত্বে ছিলাম। তখন আমার নিজ উপজেলা কুতুবদিয়ার মাহফিলে একসাথে যাওয়ার পথে একটি ঘটনায় ওনার সাহসিকতা আমাকে যুগপৎ হতবাক ও মুগ্ধ করেছে।

মাহফিলের দিনটি ছিল জুমাবার। বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ব্যক্তিগত সচিব রাফে সামনানকে সাথে নিয়ে আল্লামা সাঈদী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌছান। তাঁকে নিয়ে ওইদিন আমি চট্টগ্রাম মহানগরীর তৎকালীন আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের এবং অধ্যাপক মফিজুর রহমান ভাইসহ চট্টগ্রাম থেকে রওনা হই। সাঈদী সাহেবের গাড়িটি কল্লবাজার সড়কের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ির সামনে পথ চলছিল। জুমার সময় ঘনিয়ে আসায় তিনি চন্দনাইশ এলাকায় একটি মসজিদ দেখে নামাজের জন্য গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন। উক্ত এলাকাটি ছিল একটি বিশেষ তরিকার অনুসারীদের প্রভাবাধীন। আমরা খুবই শঙ্কিত ছিলাম যে, সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে কি না? তাই আমরাও গাড়ি থামিয়ে দ্রুত নেমে আল্লামা সাঈদীকে এ মসজিদে প্রবেশ না করার অনুরোধ করি। আমরা বলি যে, আমরা

সামনে গিয়ে কোনো নিরাপদ এলাকায় নামাজে শরিক হব। কিন্তু তিনি ‘তাওয়াঙ্কালতু আলাল্লাহ’ বলে ওই মসজিদে ঢুকে পড়েন। মসজিদে প্রবেশ করার পর ভিন্ন এক চিত্র অবলোকন করি। হঠাৎ আল্লামা সাঈদীকে দেখে সকল মুসল্লি দাঁড়িয়ে গেলেন। ইমাম সাহেব সামনে এগিয়ে এসে ওনাকে সালাম দিয়ে মোলাকাত করে মেহরাবের দিকে নিয়ে গেলেন। ইমাম সাহেবের অনুরোধে আল্লামা সাঈদী জুমার খুতবা দেন এবং নামাজ পড়ান। সাধারণত ওই তরিকার অনুসারীদের পরিচালিত মসজিদে এ ধরনের ঘটনা বিরল—যা আল্লামা সাঈদীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটাই আকর্ষণীয় ছিল যে, ওনার সান্নিধ্যে এসে ভিন্ন মতাবলম্বীরা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত। সেদিনের দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

সালাতুল জুমা আদায়ের পর আমাদের গাড়িবহর আবার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক ধরে চলতে থাকল। পথের ধারে একটি নীরব স্থানে সেই ভরদুপুরে আমরা থামলাম দুপুরে খাবারের জন্য। শহর থেকে প্যাকেট করা ভাত, সবজি, ডাল দিয়ে গাড়িতে বসে খাওয়াদাওয়া। খাবার সেরে মাওলানা বললেন— ‘এটিও একটি অভিজ্ঞতা।’ খাবার পরে আবার যাত্রা। এবার চকরিয়ার চিরিংগা বাজার হয়ে বর্তমান পেকুয়া উপজেলা হয়ে আমরা এসে পৌছলাম মগনামা ঘাটে। এখান থেকে কুতুবদিয়াকে একটি সরল রেখার মতো দেখা যায়।

মগনামা ঘাট থেকে আমরা স্পিড বোটযোগে উত্তাল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে নিরাপদে কুতুবদিয়ায় পৌছি। আশপাশের উপজেলার মানুষ দলে দলে মাহফিলে অংশগ্রহণ করে। এলাকার লোকদের ভাষ্য অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরবেষ্টিত এ দ্বীপের সকল মানুষ বাড়িম্বর, দোকানপাট বন্ধ করে মাহফিলে হাজির হয়েছিল। সাঈদী সাহেব সন্ধ্যার পর মাহফিলে কুরআনের তাফসির পেশ করেন।

পরের দিন কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের জেলেপাড়া ময়দানে প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় ওনার তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আমিও আল্লামা সাঈদীর সাথে উক্ত মাহফিলে উপস্থিত হই। ওই মাহফিলে ওনার আলোচনায় কুতুবদিয়াকে নিয়ে একটি হাসি-রহস্যের ঘটনা ঘটে। পূর্বের দিন কুতুবদিয়ার মেহমানদারিতে সামুদ্রিক মাছের তরকারি ছিল। মাছটি ওনার অপরিচিত হওয়ায় তিনি নাম জিজ্ঞেস করলে আমরা কক্সবাজারের স্থানীয় নাম ‘গোয়ারা মাছ’ বলে জানাই। কক্সবাজারে মাহফিলে আলোচনার একপর্যায়ে তিনি

রসিকতা করে গোয়ারা মাছকে বলেছিলেন ‘গোমরা মাছ’। তিনি বললেন, ‘মানুষ গোমরা হয় এটি জানতাম, কিন্তু কুতুবদিয়া এসে জানতে পারলাম, মাছও গোমরা হয়।’ এ কথা শুনে শ্রোতাগণ সম্বরে হেসে দেয়।

এভাবে আল্লামা সাঈদী সাধারণ বিষয়কে সুন্দরভাবে উপমা দিয়ে আলোচনাকে সহজবোধ্যভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন। তাফসির মাহফিলে তিনি শ্রোতাদের সময়োপযোগী বিষয় ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতেন। আবার কখনও কখনও নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরে তাদের মাঝে ইসলামের বৈপ্লবিক চেতনা তৈরি করতেন— যা একজন যোগ্য দাঈ ইল্লাল্লাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

৫. তাফসিরের মাঠে নতুন ধারার প্রবর্তক

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ছিলেন তাফসির ও ওয়াজ-মাহফিলের ময়দানে নতুন ধারার প্রবর্তক। তাফসির মাহফিলের ময়দানে তিনি বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। এর পূর্বে উলামায়ে কেরাম তাদের মাহফিলে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় হুকুম-আহকাম পালনের ফজিলত ও বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম হিসেবে প্রচার করতেন। আল্লামা সাঈদী প্রচলিত এ ধারা থেকে বের হয়ে কুরআন-হাদিস ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালান। এর প্রভাব সাধারণ শ্রোতাদের পাশাপাশি উলামা ও ওয়ায়েজিনের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। ফলে আলেম ও ওয়ায়েজগণও আল্লামা সাঈদী সাহেবের মাহফিলে অংশগ্রহণ করতেন। ওনার আলোচনার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল রপ্ত করে নিজেদের মাহফিলে শ্রোতাদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতেন। অতএব বলা যায়, আল্লামা সাঈদী ছিলেন তাফসিরের ময়দানের সমকালীন রোলমডেল।

আল্লামা সাঈদী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করা একজন আদর্শ নেতা ও একজন উচ্চমানের দাঈ ইলাহিয়াহ। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়ে দলীয় পরিচয়ের বাইরে নিজের ইমেজ, সুনাম ও মর্যাদা যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তা একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। কিন্তু তিনি এই ইমেজকে নিজের জন্য ব্যবহার না করে ইসলামী আদর্শের জন্য ও ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের জন্য বিনিয়োগ করেছেন। যারা আল্লামা সাঈদী সাহেবের তাফসির শুনেছেন, তাদের অধিকাংশ লোকই কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। সাংগঠনিক জীবনে আমি অনেককে পেয়েছি, যারা বলেছেন—‘আল্লামা সাঈদীর তাফসির শুনে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং ইকামতে দ্বীন প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ ইবাদত—এ কথা বুঝতে পেরেছি। এ উদ্দেশ্যে জামায়াতবদ্ধ সাংগঠনিক জীবনযাপনের জন্য জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।’

আল্লামা সাঈদী ঘোঁসের একজন দক্ষ দাঈ হিসেবে ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেননি; বরং মানুষের লালিত ভুল চিন্তাধারার পরিবর্তন করে ইসলামকে একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে তিনি সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বামপন্থি বুদ্ধিজীবী ও লেখক আহমদ ছফা তাঁর এক প্রবন্ধে আল্লামা সাঈদীর তাফসিরের ক্যাসেটের প্রভাব সম্পর্কে একটি বিরল ঘটনা তুলে ধরেছেন, তিনি লিখেছেন—

“আমার বিচারে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বোত্তম আশ্চর্য বস্তু হলো— হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী। তাঁকে কী কারণে এ দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করতে হলো, সেটা একটু ব্যাখ্যা করার দাবি রাখে। গত ফাল্গুনে আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখি, আমার ভ্রাতৃবধূ কে-টু সিগারেট পান করছেন এবং ক্যাসেটে দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবের মিলাদ শুনছেন। আমার বাবা-মা যদিও বেঁচেছিলেন, ওই মহিলাকে জোর করে একবারও নামাজের পাটিতে দাঁড় করাতে পারেননি। আমার ভাইও অনেক চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। আমি দেখলাম, হযরত সাঈদী এ মহিলার অন্তরে ধর্মপিপাসা জ্বালাত করতে সক্ষম হয়েছেন। তারপরও যদি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে আমি রাজি না হই, নিজের উৎকৃষ্ট অংশের প্রতি আমি অবিচার করব। ভাবীর এ রূপান্তর দেখে আমি নিজেও হযরতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। তার কারণ আছে। অন্য মাওলানার মিলাদ আমি শুনছি। তাঁরা ধর্মকথা-পুণ্যকথা বলেন। কিন্তু সেগুলো বোরিং লাগে। মাওলানা সাঈদীর ক্যাসেট যখন শুনলাম, বুঝতে পারলাম মিলাদ কাকে বলে!”

(ত্রি বঙ্গাশ্চর্য পরিচয়/আহমদ ছফা) নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ, ১৯৯৫

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কুরআনের সম্মোহন শক্তি দ্বারা শুধু নিজে আলোকিত হয়েছেন তা নয়; বরং লাখো জনতার অন্তরে কুরআন, সুন্নাহ ও হিদায়াতের আলো জ্বালিয়ে গেছেন।

৬. প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ

আব্দুলামা সাঈদী সাহেব দাঈ ইল্লাহাহর পাশাপাশি একজন প্রভাবশালী ইসলামী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জামায়াতের গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগঠনের জনশক্তির সর্বোচ্চ স্তর তথা রুকনিয়াত হাসিল করেন। আব্দুলামা সাঈদী পর্যায়ক্রমে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা, কর্মপরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আব্দুলামা সাঈদী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সভা-সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কর্মীদের সাহচর্য দিতেন এবং গঠনমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতেন। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। তিনি তাফসিরের ময়দানে সারগর্ভ আলোচনা ও সুরের সম্মোহনী শক্তি দিয়ে শ্রোতাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাখতেন। আবার রাজনৈতিক সমাবেশে স্বল্প সময়ে চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করে শ্রোতাদের মাঝে জাগরণ তৈরি করতেন। এতে বোঝা যায়, দ্বীনের দাঈর পাশাপাশি বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের যোগ্যতাও আব্দুলাহ তায়ালা আব্দুলামা সাঈদীকে দিয়েছিলেন। বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশ ও পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত উলামা-মাশায়েখ সমাবেশ, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের উজানে টিপাই নদীর মুখে বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যগুলো ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আব্দুলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অসংখ্য বক্তব্যের মধ্যে একটি বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—যা শুনে দেশপ্রেমিক মানুষ এখনও উজ্জীবিত হয়। এ বক্তব্যটি তিনি চট্টগ্রামের আউটার স্টেডিয়াম মাঠে

জনতার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি বলেছিলেন—

“বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে উত্তর গগনে কালো মেঘ জমা হয়েছে। ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ করছি। যদি মোকাবিলা করতে না পারেন সক্ষমভাবে, তাহলে এমন অন্ধকার গাঢ়, কালো, অমাবস্যার রাত আসতে পারে, যার সুবেহ সাদিক হওয়া অসম্ভব। আপনারা কি কাপুরুষের মতো কাফের, মুশরিকদের গোলামি করে মরতে চান? বিড়ালের মতো পাঁচশত বছর বেঁচে থেকে লাভ নেই, সিংহের মতো এক ঘণ্টা বাঁচতে চাই।”

আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনামলে ভিন্নমতের অনুসারী দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লামা সাঈদীর এ বক্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ করছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে আল্লামা সাঈদী অতিথি হিসেবে উপস্থিত হতেন। নব্বইয়ের দশকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী একটি সমাবেশের আয়োজন করে। উক্ত সমাবেশে আমরা কয়েকজন মঞ্চের শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আল্লামা সাঈদী সাহেব তখন মঞ্চ উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা এখনও স্মৃতিতে অল্পান হয়ে আছে। সমাবেশ চলাকালে মঞ্চের সামনে একজন লোকের গতিবিধি ওনার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়। তখন তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডেকে নিয়ে বিষয়টি জানালেন। অতঃপর আমরা অত্যন্ত সুকৌশলে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সন্দেহভাজন লোকটিকে নিরাপদে অন্যত্র সরিয়ে নিতে সক্ষম হই। পরে জানা গেল, সমাবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ মহলের পক্ষ থেকে লোকটিকে মঞ্চের সামনে পাঠানো হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার রহমতে সমাবেশটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। পরবর্তী সময়ে আল্লামা সাঈদী এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালনের প্রশংসা করেন। এ ঘটনায় বোঝা যায়—তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতাও ছিলেন; যার শূন্যতা পূরণ হওয়া কঠিন।

সংস্কৃতিপ্রিয় আল্লামা সাঈদী

আমার ছাত্রজীবনের আরেকটি ঘটনা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। ১৯৯১ সালে শিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন শেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তখন আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। ওই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আত্মসন রোধ ও সুস্থধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশের গুরুত্বের ওপর আলোচনা রাখেন। কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘দুর্নিবার’ একটি নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি নিয়ে মঞ্চে আসে। নাটকের নাম ‘সুবর্ণপুরের সুবর্ণ দিন’। থিমটি ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এরই মধ্যে এশার নামাজের বিরতি হলে মঞ্চের সামনে কালো পর্দা টেনে দেওয়া হয়। উপস্থিত দায়িত্বশীলবৃন্দ ও শিল্পীরা মঞ্চে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যান। নামাজে ইমামতি করেন আল্লামা সাঈদী। নামাজ শেষে দুর্নিবারের শিল্পীরা সকলে তাঁর সাথে মোলাকাত করে পরিচিত হন। ওনাকে কাছে পেয়ে শিল্পীরা খুবই খুশি হন।

নামাজের পর আল্লামা সাঈদী মঞ্চের নিচে সামনের সারিতে বসে নাটক দেখছিলেন। আমি তাঁর পাশের আসনেই বসা ছিলাম। নাটকের একটি দৃশ্য শেষ করে আরেকটি দৃশ্য শুরুর মাঝখানে সামান্য সময় পেলে তিনি আমার সাথে নাটকের কিছু কিছু বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছিলেন। নাটকের মধ্যে একজন পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র ছিল। এ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দুর্নিবারের দক্ষ অভিনেতা মাসুম। অভিনেতা পণ্ডিত মশাইয়ের মাথা মুগুনো অবয়ব ও বেশভূষা ছিল হিন্দু পণ্ডিতের সাথে অভূতপূর্ব মিল। নাটকের মধ্যে পণ্ডিত মশাইয়ের একটি ডায়ালগ ছিল—‘মঙ্গল, মঙ্গল।’ অভিনেতার চেহারা, বাচনভঙ্গি ও ডায়ালগের মাঝে সাদৃশ্য ও চমৎকার পরিবেশনা পুরো অডিয়েন্সকে বিমোহিত করেছিল। নাটকের এ চরিত্রটি নিয়ে তিনিও খুব হাস্যরস করেছিলেন। নাটক শেষ হলে তিনি অভিনেতাকে ডাকার জন্য আমাকে বললেন। অভিনেতা কাছে এলে আল্লামা সাঈদী হাসির ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন—‘আপনি কি হিন্দু?’ এ কথা শুনে অভিনেতা বলে ওঠেন—‘না, আমার নাম মাসুম এবং আমি আপনার একজন ভক্ত।’ এ কথা শুনে তিনি সহাস্যে বলেন—‘আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ!’ অতঃপর তিনি মাসুমের চমৎকার অভিনয়ের প্রশংসা করেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দু’আ করেন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতি ভালোবাসা

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি জেলখানার কষ্টকর জীবনেও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কথা বারবার স্মরণ করতেন। আমাদের কাছ থেকে ছাত্রশিবির সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। শিবিরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে, তিনি কারাগারে বসে শিবিরের জন্য গান লিখেছিলেন—

শিবির আমার প্রাণ
খোদার সেরা দান।
আল্লাহ মেহেরবান,
আল্লাহ মেহেরবান।

ওনার কারাজীবনে লেখা এ গানটি সুর করেছেন শিল্পী বিপ্লব আনোয়ার—যা শিবিরের সংগীতশিল্পীরা মধুর কণ্ঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে শ্রোতাদের উজ্জীবিত করে থাকে।

ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম ও নেতা-কর্মীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে চট্টগ্রামের তাফসির মাহফিলে তিনি বলেছিলেন—

“ইসলামী ছাত্রশিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র অঙ্গনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড়ো নিয়ামত।”

দেশে বিদ্যমান সহশিক্ষার মাঝে ছাত্রদের আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অনন্য অবদানের প্রশংসা করতেন তিনি। সেইসাথে অভিভাবকদের নিকট তাদের জন্য দুআ চাইতেন। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামের আলোকে জীবন গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কখনও কখনও তাদের নিজের কাছে ডেকে আনতেন এবং কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহ দিতেন।

৭. জননন্দিত জননেতা

আব্দুলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাকসিরের ময়দানে যেমন অসামান্য জনপ্রিয় ছিলেন, তেমনি রাজনীতির ময়দানেও অত্যন্ত জননন্দিত নেতা ছিলেন। তিনি পিরোজপুর-১ আসন থেকে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে পরপর দুবার বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীও ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। এ নির্বাচনী এলাকা থেকে ওনার পূর্বে আওয়ামী লীগের টিকিটে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এমপি ছিলেন। একটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে তাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রার্থীর বিপরীতে নির্বাচনে জয়ী হওয়া মোটেও সহজ বিষয় ছিল না। কতটা জনপ্রিয় হলে বারবার নির্বাচিত প্রার্থীকে পরাজিত করা যায়, তা আব্দুলামা সাঈদী তাঁর এ বিজয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তাঁকে শুধু মুসলিম ভোটাররা নয়; বরং এলাকার হিন্দু ভোটাররাও উল্লেখযোগ্য ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিল। এতে প্রতীয়মান হয়, আব্দুলামা সাঈদী অমুসলিমদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর শেষ বিদায়ের দিন অসংখ্য অমুসলিমের উপস্থিতিতে এর সর্বশেষ প্রমাণ মেলে।

আব্দুলামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন দক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান হিসেবে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তখন আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর জাসদ ও জাপার সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রধান বিরোধী দল ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। এ সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য সংখ্যা মাত্র তিন জন হলেও আব্দুলামা সাঈদী যেন ছিলেন একাই একশো।

৭ম সংসদের বৈরী পরিবেশে আব্দুলামা সাঈদীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসী। সংসদ অধিবেশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুসমূহ এবং বিভিন্ন

ইসলামিক ইস্যুতে তথ্যভিত্তিক ক্ষুরধার বক্তব্য রাখতেন। তাঁর বক্তব্য প্রদানকালে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি সংসদ সদস্যগণ নিছক বিরোধিতার কারণে সংসদে হট্টগোল করলেও তাঁর সাহসী উচ্চারণ স্তব্ধ হতো না। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্য-উপাত্ত ও কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করতেন—যা অনেক প্রবীণ পার্লামেন্টেরিয়ানকেও হার মানাত।

জাতীয় সংসদে দেশ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন রচিত হয়ে থাকে। আইন প্রণয়ন ও সংসদের রীতি পরিবর্তনে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যোগ্যতার সাথে ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশ প্রথার অনুসরণে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে ২৬৭ (২) ধারা অনুযায়ী সংসদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় সদস্যদের মাথা ঝাঁকাতে হতো। ১৯৯৬ সালে আল্লামা সাঈদী প্রথমবারের মতো সংসদ অধিবেশনে নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে তিনি বলেন—

“আমাদের সংবিধানে আছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে আমাদের জাতীয় কার্যাবলির ভিত্তি। সুতরাং সংসদের কার্যপ্রণালীর বিধি ২৬৭ (২) সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। মাথা ঝাঁকানোর এই শিরকি বিধি চালু থাকলে সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে আল্লাহর কাছে অপরাধী হতে হবে। সুতরাং সংসদের এই বিধি অনতিবিলম্বে বাতিল করা হোক।”

আল্লামা সাঈদীর প্রস্তাবে তৎকালীন সংসদ সদস্যবৃন্দ অনেক আলোচনার পর ওই বিধি বাতিল করতে বাধ্য হন—যা এখনও কার্যকর আছে। এখন কোনো সংসদ সদস্যকে মাথা ঝাঁকিয়ে সংসদে ঢুকতে বা বের হতে হয় না। সালাম দিয়ে যাওয়া-আসা করা যায়। এ নিয়ম আল্লামা সাঈদী সাহেবের মাধ্যমেই সংসদে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

আল্লামা সাঈদী ২০০১ সালে দ্বিতীয় দফায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। অষ্টম জাতীয় সংসদের শেষের দিকে ২০০৬ সালের ২৯ আগস্ট কওমি সনদের স্বীকৃতির ওপরে বিল উত্থাপন করেন আল্লামা সাঈদী। জাতীয় সংসদে সাঈদী সাহেবের উত্থাপিত এ বিলের পরিপ্রেক্ষিতে দাওরায়ে হাদিসকে ইসলামিক স্টাডিজ ও অ্যারাবিক লিটারেচারের গ্র্যাজুয়েশন সমমান এবং ডিম্বধারীদের সরকারি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন জারি করে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার। আর তা

পরবর্তী সময়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। কওমি শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ও আলেমদের মধ্যে দ্বিমত থাকায় এ বিলের ফলাফল কার্যকর করতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অধিকন্তু সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় গেজেট প্রকাশের পরও এ বিল তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী সরকারের চতুর প্রধানমন্ত্রী কওমি সনদের স্বীকৃতির পুরো কৃতিত্ব আওয়ামী সরকারের বলে জোর গলায় দাবি করে বসেন। অথচ আল্লামা সাঈদীই সর্বপ্রথম যেই নোটিশ দিয়েছিলেন, তা কার্যকর করার জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল। কওমি শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের পেছনের ইতিহাস চরমভাবে বিকৃত করে ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক সমাবেশে শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ নামে আখ্যায়িত করা হয়। কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির পুরো কৃতিত্ব আওয়ামী লীগ সরকারের বলে প্রচারের যে অপকৌশল গ্রহণ করা হয়, তা জাতির কৃতিসন্তান ও গুণীজনের অবদানকে অস্বীকার করার শামিল।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর আল্লামা সাঈদী স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অবর্তমানে সংসদ অধিবেশনে কখনও কখনও স্পিকারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্যতার সাথে সংসদ পরিচালনা করেছেন। তা ছাড়া একাধিক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সভাপতির দায়িত্বও তিনি সফলতার সাথে পালনের মাধ্যমে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) জনগণের কল্যাণে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর উন্নয়ন কার্যক্রম ছিল দৃশ্যমান ও আলোচিত। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে কেন্দ্রীয় অফিসে আলাপকালে বলতে শুনেছি, ‘এ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর যত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে আল্লামা সাঈদী সাহেব সবচেয়ে বেশি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন।’

আল্লামা সাঈদী অত্যন্ত সচ্ছতার সাথে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে জনগণের সুনাম অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুদান-সহযোগিতায় অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

এতিমখানা, হাসপাতাল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তিনি। তাঁর এ অবদান ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল ভোগ করছেন নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম ও দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। এলাকার মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা আল্লামা সাঈদীর নিকট অনায়াসে বলতে পারতেন। তিনি সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে তিনি কোনো ভেদাভেদ করতেন না। অমুসলিম নাগরিকরাও তাঁর কাছে যথাযথ গুরুত্ব পেতেন। তাঁর এলাকার হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন—‘আমরা দরিদ্র ও অসহায় ছিলাম। সাঈদী হুজুরের মতো একজন ভালো মানুষ এমপি হওয়ার পর আমরা তাঁকে সুখে-দুঃখে কাছে পেয়েছি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং আর্থিক অনুদান দিতেন। তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালীন এলাকায় কোনো প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক হানাহানি ছিল না। এ সময়ে আমরা মায়ের কোলের শিশুর মতো নিরাপদে জীবনযাপন করেছি।’

৮. দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ খাদেম। সারা জীবন তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাকওয়া ও ইখলাসের সাথে দ্বীনের খেদমত করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন। মানুষের প্রশংসা পাওয়া, খ্যাতি অর্জন বা পার্শ্বিক বিনিময় লাভ করা নয়; বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ওনার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল। এ জন্য মানুষ ওনাকে মন দিয়ে ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। ওনাকে একনজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসত মানুষ। এ বিষয়ে ওনার অনুভূতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী; তিনি বলতেন—

‘আমি এই ভয়ে পেরেশান থাকি যে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করেন—হে আমার বান্দা! আমি যা দেওয়ার তা তোমাকে দুনিয়াতে দিয়েছি। ইজ্জত, সম্মান, মানুষের ভালোবাসা ও প্রশংসা সবই তো তুমি দুনিয়াতে পেয়ে গেছ। আখিরাতে তুমি আর কী চাও আমার কাছে?’

এ কথা বলে চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে তিনি বলতেন—

‘মানুষ যখন আমার খ্যাতি, মর্যাদা ও প্রশংসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন আমি রাসুলুলামিনের কাছে জবাবদিহিতা ও তাঁর জিজ্ঞাসার ভয়ে পেরেশান থাকি।’

আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর এই পেরেশানি সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার মানুষের দেওয়া মর্যাদার চেয়ে আল্লাহর কাছে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হওয়াকেই তিনি বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। দুনিয়ার স্বার্থ ও লোভ-লালসা তাঁকে বিমোহিত করত না। এত জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার পরও তাঁর মাঝে অহংকারের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হতো না।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) দীর্ঘ দশ বছর জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সময় প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে সততার সাথে কাজ করতেন। এমনকি নির্বাচনী এলাকায় সফরকালে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ওনার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করতে আগ্রহী হতো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না এবং তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এ ধরনের আয়োজন করে যেন সরকারি অর্থের অপচয় না করে। এ দীক্ষা তিনি একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন হিসেবে কুরআন-হাদিস থেকে শিখেছেন, তেমনি জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠনের নীতি ও আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। জামায়াতে ইসলামীর মন্ত্রী-এমপিগণ সফরে কখনও সরকারি অর্থ ব্যয় করে আপ্যায়নের আয়োজন পছন্দ করতেন না; বরং ব্যক্তিগত তহবিল বা স্থানীয় সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন।

৯. কারাবরণ

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার, সমাজ ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর যোগ্যতা ও বহুমুখী প্রতিভার খ্যাতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ইসলামের পরিচয় সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের পথে ধাবিত করার কারণেই ইসলামবিরোধী শক্তি শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পেরেছিল, আল্লামা সাঈদীর দাওয়াহ কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করা না গেলে বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন দিনদিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই তারা নানা অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদীকে প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালায়। তাঁর মর্যাদা ও খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করার জন্য একশ্রেণির মিডিয়ার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণের মাঝে এর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। ইসলামবিরোধী শক্তির এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আল্লামা সাঈদীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

২০১০ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের মহাসচিব সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরীকে দিয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথিত অজুহাতে ঢাকার জজ কোর্টে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে ষড়যন্ত্রকারীরা। আরেকটি মামলা লালমনিরহাটে দায়ের করে জনৈক আওয়ামী লীগের নেতা অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান। দুটি মামলায় একই অভিযোগ আনা হয়েছে। দায়েরকৃত মামলায় ওই বছর ২৯ জুন রাজধানীর শহীদবাগের নিজ বাসা থেকে পুলিশ আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ যখন তাঁর বাসভবনে যায়, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। পাশে ভাইয়ের বাড়িতে অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। বাসায় পুলিশ হানা দিয়েছে—এ খবর শোনামাত্র আল্লামা সাঈদী তৎক্ষণাৎ নিজ বাসায় ফিরে আসেন। তখন পুলিশ তাঁকে বিনা বাধায় আটক করতে সক্ষম হয়।

একই দিন একই মামলায় জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সাহেবকেও গ্রেফতার করা হয়। পরদিন সিএমএম কোর্টে নেতৃবৃন্দকে হাজির করানোর সংবাদ পেয়ে আমরাও সেখানে উপস্থিত হই। ওইদিন আদালতে একটি অমানবিক দৃশ্য স্মরণ হলে এখনও নিজেদের অসহায় মনে হয়। গ্রেফতারকৃত তিন নেতাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। সেই হিসেবে দেশের প্রচলিত আইন ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী যে প্রটোকল পাওয়ার কথা ছিল, প্রশাসন তা চরমভাবে লঙ্ঘন করে। সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ওনাদের অপমানজনকভাবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। শুধু তা-ই নয়, সরকারদলীয় সম্মানসী বাহিনী ও আইনজীবীদের মাধ্যমে আদালত প্রাঙ্গণে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে আইনজীবীদের সাথে নিয়ে আমরা আদালতের কক্ষে প্রবেশ করলে একটি লোমহর্ষক দৃশ্য চোখে পড়ে। আদালতের একপাশে লোহার শিকের জিঞ্জিরে আবদ্ধ খাঁচায় সাবেক আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, কুরআনের পাখি আল্লামা সাঈদী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ শাস্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

শত শত আইনজীবীর ভিড় অতিক্রম করে খাঁচার সামনে উপস্থিত হয়ে আমি তিনজনকে সালাম দিয়ে মোলাকাত করার চেষ্টা করি। সেখানে সরকারদলীয় উচ্ছৃঙ্খল আইনজীবীরা বাধার সৃষ্টি করলে কিছুটা বাকবিতণ্ডা হয়। তখন আমি জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলাম। তাদের মধ্যে একজন আমাকে চেনার পর সামনে এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে বিচারক সবাইকে শাস্ত হওয়ার আদেশ দেন। তখন আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে খাঁচার সাথে দাঁড়িয়ে আমার তিনজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় নেতাকে সালাম প্রদান করলে তাঁরা হাসিমুখে জবাব দেন। এরপর ওনাদের খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করি। আলাপচারিতায় ওনাদের শক্ত মনোবল ও ঈমানি দৃঢ়তা দেখে আমি অভিভূত হই। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর থেকে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু আমাদের মজলুম নেতাদের মাঝে এর লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয়নি।

কিছুক্ষণ পর আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে আইনজীবীগণ নেতৃবৃন্দের জামিনের আবেদন করলে শুনানির পর ধর্মীয় অনুভূতির মামলায় আটককৃত উপস্থিত সকলকে জামিন দেওয়া হয়। জামিনের আদেশ শুনে আমরা সবাই

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। তবে মনের মধ্যে এক অজানা আশঙ্কা কাজ করছিল। কিছুক্ষণ পর সত্যিই তা ঘটে গেল। বিচারক আরেক আদেশে তাঁদের তিনজনকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধানায় দায়েরকৃত তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে জেলখানায় প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। এ সময় আদালত কক্ষে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সকলের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কেউ এ অন্যায় আদেশ ও মিথ্যা মামলা মেনে নিতে পারছিল না। তিনজন সম্মানিত নেতাই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং নানা জটিল রোগে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় বন্দিজীবন ছিল তাঁদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও অমানবিক। এই তিন শীর্ষনেতা সারা জীবন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মানুষের কল্যাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শুধুমাত্র ইসলামের পথে জীবনযাপন ও এ দেশে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে তাঁদের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রেরণ করা হয়। এ যেন আল কুরআনের সেই বাণীরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন—

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

“তারা (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) মুমিনদের নির্যাতন করেছিল কেবল এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।” সূরা বুরূজ : ৮

১০. শ্বাসরুদ্ধকর একটি দিন

২০১০ সালের ৩০ জুন দুপুরবেলা এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে ঢাকার সিএমএম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট আব্বাস সাঈদীসহ জামায়াতে ইসলামীর তিন শীর্ষনেতাকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ প্রদান করে এজলাস ত্যাগ করেন। এ সময় আমরা আদালতের খাঁচায় বন্দি নেতৃবৃন্দের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করি। নেতৃবৃন্দ আমাদের মাধ্যমে দেশবাসী ও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের শান্ত থাকার জন্য বলেন এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সরকারের অন্যায় আচরণে নানা কষ্ট ও পেরেশানির মাঝেও নেতৃবৃন্দ যে ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বিরল দৃষ্টান্ত বলা যায়।

আমাদের আলাপ শেষ হওয়ার আগেই পূর্বপ্রস্তুতি মোতাবেক পুলিশ আমাদের প্রাণাধিক নেতৃবৃন্দকে খাঁচা থেকে বের করে আদালতের গারদে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পুলিশ প্রটেকশনে নাজিম উদ্দিন রোডে অবস্থিত তৎকালীন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওনা করে। আদালতের বাইরে সকাল থেকে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার জনগণ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাদের একনজর দেখার জন্য গাড়ির সামনে এগিয়ে আসে। তবে পুলিশের বাধার কারণে তারা সফল না হওয়ায় অশ্রুকাতর চোখে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় নেতাদের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করে বিদায় জানায়।

আদালতের ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, বাইরের পরিবেশ অনেক উত্তেজনাপূর্ণ। ওইদিন সকাল থেকে আদালত প্রাঙ্গণে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকায় সাধারণ মানুষকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা অসদুদ্দেশ্যে আদালত এলাকায় প্রবেশ করে এবং উসকানিমূলক শ্লোগানের মাধ্যমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার অপচেষ্টা চালায়। তা দেখে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য

অ্যাডভোকেট মসিউল আলম আমাকে সাথে নিয়ে পুলিশের ডিসি প্রসিকিউশনের নিকট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও আদালত প্রাপ্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যান। আদালতের মতো স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার এ ধরনের নির্লিপ্ত ভূমিকা জাতির জন্য হতাশাজনক। সেদিন আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং বিপুলসংখ্যক কর্মী আদালত প্রাপ্তি এয়েছিলেন। নেতা-কর্মীদের প্রতি পূর্ব থেকে সংগঠনের নির্দেশনা ছিল—আদালত প্রাপ্তি যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এ নির্দেশনা মেনেই কর্মীরা সেদিন চরম ধৈর্যের সাথে মনের কষ্ট ও বেদনাকে পাথরচাপা দিয়ে নিজেদের সংযত রেখেছিল। ফলে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সেদিন ঘটেনি। শুধু ওই দিনেই নয়, বরং বিভিন্ন উত্তেজনার পরিস্থিতিতে কর্মীদের আনুগত্য ও শৃঙ্খলা মেনে চলার দৃষ্টান্ত আমরা অতীতেও লক্ষ করেছি। মূলত এটিই ইসলামী আন্দোলনের বড়ো শক্তি।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের অনেককেই আদালত প্রাপ্তি থেকে পুলিশের অতি উৎসাহী সদস্যরা গ্রেফতার করে। সিএমএম কোর্টের সামনে সেদিন বংশাল থানার ওসি সালাউদ্দিনের সাথে আইনজীবীদের বাকবিতণ্ডাও হয়। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা সেদিন আইনের আদালতে বিচারপ্রার্থী হয়ে এসে প্রটেকশন পাননি; গ্রেফতার হয়েছিলেন নির্বিচারে। অন্যদিকে জজকোর্টের সামনের রাস্তায় সরকারি দলের লেলিয়ে দেওয়া ছাত্রলীগ নামধারী গুন্ডাদের হাতে অনেকেই নাজেহাল হয়েছেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দৃশ্য ছিল—প্রিজনভ্যান যখন চলতে শুরু করে, তখন মাওলানা সাঈদী ভ্যানে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। এ সময় সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডারা প্রিজনভ্যানে পর্যন্ত আক্রমণ করে এবং মাওলানা সাঈদীর আঙুলে আঘাত করে।

এ ঘটনার দিন আদালতের ভেতরের পরিবেশও ছিল অনেক উত্তেজনাকর। নেতৃবৃন্দের জামিন শুনানি করতে কয়েকশ আইনজীবী উপস্থিত হয়েছিলেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীদের উপস্থিতি দেখে সরকারপক্ষের আইনজীবীরাও তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে ওঠে। একদিকে মামলাটি ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট এবং মামলার মেরিটও ছিল দুর্বল, অন্যদিকে মামলার জামিন শুনানিতে আমাদের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক ও আইনের রেফারেন্সগুলো ছিল

অত্যন্ত জোরালো। এর বিপরীতে সরকারপক্ষ ক্ষমতার দাপট দেখানো ছাড়া জামিন নামঞ্জুরের পক্ষে কোনো যুক্তি ও আইনের বিধান উপস্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আওয়ামী সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ থাকায় গুনানি শেষে বিজ্ঞ আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন বা করতে বাধ্য হন। এর মাধ্যমে সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে; শুধু তা-ই নয়, দেশের স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসনের প্রতিও তাদের নজিরবিহীন নগ্ন হস্তক্ষেপের সূচনা হয়। এই হস্তক্ষেপ পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১১. কারাগারে পেলাম একান্ত আপনজনদের

আল্লামা সাঈদীসহ নেতৃবৃন্দকে সেদিন আদালত থেকে ব্যথিত মনে বিদায় দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় ওনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়নি। কারণ, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য কাউকে কারাগারে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হতো না। আমরা পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সার্বিক খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে মনের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতাম। সেইসাথে ঢাকা মহানগরী অফিসের সামনের গলিতে নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে কর্মসূচি পালন করতাম। তখন সরকারের বাধা, জেল-জুলুম ও দমন-নিপীড়ন এত ভয়াবহ ছিল যে, নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে রাজপথে কর্মসূচি পালন করাও ছিল দুষ্কর।

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঢাকা মহানগরী জামায়াত প্রশাসনিক বাধা ও ভীতি উপেক্ষা করে রাজপথে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে মহানগরী জামায়াত। পুলিশ বিনা উসকানিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশের হামলায় কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয় এবং অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

এ ধরনের একটি মিথ্যা মামলায় ২০১১ সালে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন নায়েবে আমীর এ কে এম নাজির আহমাদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা রফিউদ্দিন আহমদ ও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মা'ছুম সাহেব এবং আমিসহ ১১ জনের হাইকোর্টে ছয় সপ্তাহের জামিন হয়। হাইকোর্ট থেকে প্রাপ্ত জামিনের মেয়াদ শেষ হলে ঢাকার নিম্ন আদালতে জামিন কনফারমেশনের জন্য আবেদন করা হয়। জামিন শুনানির ধার্য তারিখে আমরা ১১ জন আদালতে হাজির হই। তখন আমি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলাম। নিম্ন আদালতে যাওয়ার কয়েক দিন

আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত একটি সমাবেশে সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছিলাম। সমাবেশ শেষ হওয়ার পর একজন (সরকারি কর্মকর্তা) আমাকে বললেন— ‘আপনার এ বক্তব্য সরকারের উর্ধ্বতন মহলে রিপোর্ট হলে আপনাকেও গ্রেফতার করার নির্দেশ আসতে পারে।’ পরবর্তী সময়ে এ ধরনের তথ্য আরও বিভিন্ন জন থেকেও পাচ্ছিলাম। এরপরও আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখি।

জামিন শুনানির ধার্য তারিখে আদালতে যাওয়ার দিন বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ওই কথাটি স্মরণ রেখে জামাকাপড় ও ওষুধসহ অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগে রেখে গিয়েছিলাম। সরকারের দুরভিসন্ধির কারণে জামিন মঞ্জুর না হলে যেন সমস্যা না হয়। আদালতে জামিন শুনানির পর আমরা ইতোপূর্বে যে আশঙ্কা করেছিলাম, সেটিই ঘটে গেল। আমাদের মামলার জামিনের কনফারমেশন শুনানি হয়েছে, কিন্তু বিচারক আদেশ না দিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে এজলাস থেকে নেমে যান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও বিচারক এজলাসে আসছেন না। অপেক্ষার সময় দীর্ঘায়িত হলে আমাদের আইনজীবীরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। মনে হয় সরকারের কোনো নির্দেশনার জন্য বিচারক অপেক্ষা করছেন। তিন থেকে চার ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর বিচারক এজলাসে না এসে কোর্টের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আমাদের জামিন নামঞ্জুরের ঘোষণা দেন এবং জেলখানায় প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আমরা এর মধ্যে জোহরের নামাজ আদায় করে দুপুরের খাবার গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এ সময় ডিসি প্রসিকিউশনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ আমাদের আদালতের গারদে নিয়ে যায়। সেখান থেকে প্রিজন্ড্যানের করে লালবাগের নাজিম উদ্দিন রোডে অবস্থিত তৎকালীন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে জেল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। জেলগেটে কারা কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল প্রসেসিং চলতে থাকে। ততক্ষণে মাগরিবের নামাজের সময় হলে আমরা সেখানে নামাজ আদায় করি।

নামাজের পর একজন কারারক্ষী এসে আমাকে কারাগারের ভেতরে যেতে বলেন। তখন আমি বাকি ১০ জনের ব্যাপারে জানতে চাইলে ওনাদের অন্য কারারক্ষী পৃথক ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে বলে জানানো হয়। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কারারক্ষীর সাথে কিছুদূর গিয়ে ২৬ নং সেলের গেটে পৌছি, যেখানে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দিদের রাখা হতো। গেট দিয়ে ঢোকান পর কর্তব্যরত

কারারক্ষী আমাকে সরাসরি সাবেক আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের কক্ষে নিয়ে যায়। তখন সেখানে আল্লামা সাঈদী সাহেবও বসা ছিলেন। ওনাদের সামনে নাশতা রাখা ছিল। আমি সালাম জানিয়ে কক্ষে প্রবেশ করি। হঠাৎ করে আমার এই আগমন দেখে দুজনেই হকচকিয়ে গেলেন। আমাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরার পর পাশে বসালেন। আমার চেহারা দেখে ওনারা বুঝে নিলেন আমি ক্ষুধার্ত। তখন নিজেরা নাশতা না করে আমাকে খাওয়ালেন। অতঃপর আমার কাছ থেকে জেলে আগমনের বিস্তারিত ঘটনা শুনলেন। আমাদের সাথে অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ ও মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেবের জেলে আসার কথা শুনে ওনারা খুব চিন্তিত হলেন। কনকনে শীতের সময় সাধারণ বন্দিদের সাথে বয়োবৃদ্ধ মানুষগুলো কীভাবে থাকবেন, সেই চিন্তায় তাঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এরপর আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষকে নিয়ে মহান দুই নেতা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এর মধ্যে সংবাদ পেয়ে ওই সেলে বন্দি বিএনপি নেতা ও সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু, মেজর জেনারেল (অব.) রাজ্জাকুল হায়দার ও ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুর রহিম ছুটে এলেন। ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুর রহিম পরবর্তী সময়ে কাশিমপুর কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। সবাই পরামর্শ করে আমার থাকার কক্ষ ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। এশার নামাজের পর বারান্দায় ডাইনিং টেবিলে সবাই মিলে একসাথে খাওয়াদাওয়া হলো। আমার জেলজীবনে এটি নতুন অভিজ্ঞতা। সাধারণত কারাগারে মাগরিবের আগেই বন্দিদের খাওয়া সরবরাহ ও লকআপ করা হয়। ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দিদের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, তা জানলাম।

খাওয়া শেষে আমি থাকার কক্ষে প্রবেশ করে শোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার ব্যাগে শুধু ব্যবহারের জামাকাপড় ছিল। এর মধ্যে সাবেক মন্ত্রী ও আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিজের কক্ষ থেকে বিছানার চাদর এবং আল্লামা সাঈদী সাহেব শীতের কম্বল নিয়ে আসেন। আমি কিছুটা ইতস্ততবোধ করলে ওনারা জানালেন—‘আমাদের কাছে নিজেদের ব্যবহারের চাদর ও কম্বল আছে। এগুলো তোমার জন্য।’ ওনাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণে আমি খুবই আবেগাপ্ত হয়ে পড়ি। কারাগারে মানুষ সীমিত জিনিসপত্র নিয়ে কষ্টের সাথে জীবনযাপন করে থাকে। তারপরও আমার কষ্ট লাঘবের জন্য ওনারা নিজেদের ব্যবহারের জিনিসপত্র আমাকে

দিয়ে যান—যা স্বাভাবিক জীবনে একজন অভিভাবক পরিবারের কোনো সদস্যের কষ্ট দূর করার জন্য করে থাকেন। আমি ওনাদের পরিবারের সদস্য বা নিকটাত্মীয় নই। ওনাদের সাথে আমার সম্পর্ক হলো ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল ও কর্মীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও মজবুত। পবিত্র কুরআনে ‘কাআল্লাহুম বুনিয়ানুম মারছুহ’ এবং ‘রুহামাউ বায়নাহুম’ দ্বারা তা-ই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ ﴿٢٤﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।” সূরা সফ : ৪

ইসলামের শিক্ষা হলো—দ্বীনের জন্য ভালোবাসা এবং একে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন—রাসূল সা.-এর সাহাবিগণ ঈমানের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে, তার বাস্তব প্রতিফলন সেদিন এবং অগণিত বার আমি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের মাঝে লক্ষ করেছি।

১২. আল্লামার সান্নিধ্যে কারাযাপনের স্মৃতি

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ নং সেলে আমার প্রায় আড়াই মাস জেলজীবন কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সময়ের অনেক ঘটনা এখনও মনের মণিকোঠায় স্থান করে আছে। আল্লামা সাঈদী ছিলেন এমন সুন্দর সুন্দর গুণ-বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত একজন মানুষ, যার সবকিছু একটি বইয়ের সীমাবদ্ধ কলেবরে কলমের তুলিতে আঁকা কঠিন।

আল্লামাকে দেখে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও একান্ত পরিবেশে তিনি একদম সাদামাটা ও খুবই সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। জেলখানায় যাওয়ার পরদিন সকাল দশটার দিকে আমি গোসল করতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লামা সাঈদী হাতে একটি বাটি নিয়ে আমার রুমে প্রবেশ করলেন, যাতে কিছু খাবার ছিল। তিনি আমাকে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন এবং নিজেও সাথে খেলেন। ওনার মতো একজন বড়ো মাপের মানুষ এ কাজটি এত আন্তরিকতার সাথে করলেন—যা আমার চিন্তার বাইরের বিষয় ছিল। শুধু একজন হৃদয়বান ও সত্যিকার আদর্শবাদী মানুষের পক্ষেই এ ধরনের কাজ সম্ভব। তিনি কেবল আমার জন্যই এমন করেননি, বরং জেলখানায় যতদিন ছিলাম অন্য বন্দিদের সাথেও এ ধরনের আচরণ করতে দেখেছি।

ওই সময়ে ২৬ নং সেলে আমাদের সাথে আরও তিনজন বন্দি ছিলেন। তারা হলেন অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি শহীদুল্লাহ সাহেব, শহিদুল হক ও খোদাবক্স। তারা সকলেই আল্লামা সাঈদী সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন। আমরা একসাথে নামাজ পড়তাম এবং একই টেবিলে খাওয়াদাওয়া করতাম। সকালে বারান্দায় সোফায় বসে পত্রিকা পড়তাম। জেলখানায় বন্দিজীবন হলেও আল্লামা সাঈদী সবার খোঁজখবর নিতেন এবং বিভিন্ন সময়ে আলাপচারিতায় সকলকে উজ্জীবিত রাখতেন। ফলে সেখানে সব সময় সুন্দর হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করত।

পরবর্তী সময়ে ২০১৮ ও ২০২০ সালে আমাকে কয়েকবার গ্রেফতার হয়ে বন্দিজীবন কাটাতে হয়। কিন্তু সেসময় কারাগারে পূর্বের মতো এত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ না পেয়ে আল্লামা সাঈদীর শূন্যতা তীব্রভাবে অনুভব করেছি। তখন আল্লামা সাঈদীকে রাখা হয়েছিল কাশিমপুর-১ জেলখানায়। আর আমাকে কাশিমপুর-২-এ রাখা হয়েছিল। মনের মধ্যে আকাজক্ষা থাকলেও দুটি পৃথক জেলখানা হওয়ায় কাশিমপুর-১-এ গিয়ে আল্লামা সাঈদীর সাথে দেখা করার সুযোগ হয়নি। তবে মামলার হাজিরার জন্য পুরান ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত আদালতে আমাকে যখন আনা হতো, তখন একই গাড়িতে কাশিমপুর-১-এর কয়েকজন কয়েদিকে আনা-নেওয়া করা হতো। সেসব কয়েদির মারফতে আল্লামা সাঈদীর সাথে সালাম আদান-প্রদান এবং দু'আ বিনিময় করতাম।

কারাভ্যস্তরে আল্লামা সাঈদীর প্রাত্যহিক জীবন

নাজিম উদ্দীন রোডে অবস্থিত তৎকালীন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬ নং সেলে জেল কোড অনুযায়ী ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য একটি ইংরেজি ও তিনটি বাংলা পত্রিকা সরবরাহ করা হতো। আমরা সকালে নাশতার পর বারান্দায় সোফায় বসে পত্রিকা পড়তাম। সেখানকার বন্দিরা সকলেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। আল্লামা সাঈদী ছিলেন দল-মত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ওই সময়ের একটি দৃশ্য আমাকে অভিভূত করে। শীতের দিনের এক সকালে কয়েকজন ভিআইপি বন্দি বারান্দার সামনে রোদে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। তখন আল্লামা সাঈদী সাহেব রুম থেকে বেরিয়ে পত্রিকা পাঠের উদ্দেশ্যে আসেন। ওনাকে দেখার পর সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন। উনি না বসা পর্যন্ত সবাই ওনার সম্মানে দাঁড়িয়েই থাকলেন। আল্লামা সাঈদী সাহেবের প্রতি সাবেক মন্ত্রী, এমপি, আইজিপি পর্যায়ের ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের যে দৃশ্য আমি অবলোকন করেছি, তা ছিল সর্বমহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রভাব। কুরআনের মুফাসসির ও ইসলামিক স্কলার হিসেবে এ দেশের মানুষের মাঝে ওনার সাংগঠনিক পরিচয়ের বাইরে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সর্বমহলে তৈরি হয়েছিল।

আল্লামা সাঈদী মামলার হাজিরার জন্য আদালতে যাতায়াত করতেন। সকালে জেলখানা থেকে আদালতে যাওয়ার জন্য রওনা হলে সাধারণ বন্দিরা জেলের রাস্তায় ও গেটের পাশে ভিড় জমাত। ওনার সাথে সালাম বিনিময় ও

মোলাকাত করার জন্য বন্দিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এ অবস্থা দেখে কারা কর্তৃপক্ষ বন্দিদের বিরত রাখার জন্য মাইকে ঘোষণা দিত। এতেও বন্দিরা নিবৃত্ত হতো না। হজুরের দুআ নেওয়ার জন্য অনেকেই কৌশলে আশপাশে চলে আসত। জেল গেটের পাশে বন্দিদের মতস্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অনেকে আব্বাস সাঈদীর মোলাকাত লাভের জন্য প্রশিক্ষণে নাম লেখাত। এ দৃশ্য অবলোকন করে কারা কর্তৃপক্ষ এ প্রশিক্ষণও বন্ধ করে দিয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি সকলের নিকট একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মূলত ওনার এ জনপ্রিয়তাই জালাম সরকারের রোযানলে পড়ার মূল কারণ।

আব্বাস সাঈদী ছিলেন একজন পরোপকারী ও মানবদরদি ব্যক্তি। জেলখানায় বন্দিজীবনের কষ্ট নিয়ে জীবনযাপন করার পরও তিনি অন্য বন্দিদের কষ্টের খোঁজখবর রাখতেন। একদিন কারাগারে আমি ফুড পয়জনিংয়ের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। খবর পেয়ে তিনি আমার রুমে ছুটে আসেন। দীর্ঘ সময় আমার পাশে বসে তিনি সেবা করেছিলেন এবং কারা কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারকে দ্রুত ডেকে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেদিন আমাকে নিয়ে ওনার যে পেরেশানি আমি লক্ষ করেছি, তা আমাকে স্বচক্ষে দেখিয়ে দিয়েছে—আব্বাস সাঈদী একজন অকৃত্রিম মানবদরদি মানুষ ছিলেন।

একই ধরনের ঘটনা আমার আগে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ডা. তাহের ভাই ওই সময় গ্রেফতার হয়ে ২৬ নং সেলে বন্দি ছিলেন। একদিন ওনার প্রচণ্ড জ্বর হয়। আব্বাস সাঈদী (রাহি.) কারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে রাত্রিবেলা ওনার এবং ডা. তাহের ভাইয়ের কক্ষ লকআপ না করার ব্যবস্থা করেন। ডা. তাহের ভাইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী আব্বাস সাঈদী সারা রাত জেগে থেকে ওনার সেবা করেছিলেন। সেখানে আরও অনেককে বিভিন্ন সময় তিনি সেবায়ত্ত্ব দিয়েছিলেন, তা আমি তাদের জবানিতেই শুনেছি।

জেলে থাকাকালীন আব্বাস সাঈদীর এ ধরনের আচরণ সাইয়িদুনা হযরত ইউসুফ আ.-এর জেলজীবনের সুন্নাতের অনুসরণ বলেই প্রতীয়মান হয়। হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে বন্দিদের সাথে সেবা ও সদাচরণের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এরপর তাদের মাঝে আব্বাসের উলুহিয়াতের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আব্বাস তায়ালা বলেন—

يُصَاحِبِي السِّجْنِ ۖ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٢٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَيِّئُتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“হে কারাগারের সঙ্গীরা, পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করে থাকো, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ এদের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। (জেনে রাখো) আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০

১৩. কারাগারেও সুবাস ছড়ায় যে ফুল

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। কারাগারের বাইরে থাকতে যেমনিভাবে দেশে-বিদেশে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তেমনি জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায়ও তাঁর এ দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ থাকেনি। তাঁর এই দাওয়াতি তৎপরতা আমি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করি। জেলখানার বন্দিদের সাথে হাঁটাচলার সময়, খাওয়ার টেবিলে, নামাজের আগে-পরে এবং পত্রিকা পড়ার সময় যখনই তিনি সুযোগ পেতেন, অত্যন্ত সুচারুরূপে দাওয়াতি কাজ করতেন।

কখনও কখনও এমন দৃশ্য দেখেছি, সন্ধ্যা অথবা রাতের খাবারের পর ২৬ নং সেলের বারান্দার ঘিলের সাথে দাঁড়িয়ে কারারক্ষীরা আল্লামা সাঈদীকে একনজর দেখা, সালাম দেওয়া, কথা বলা এবং দুআ নেওয়ার জন্য ভিড় জমাত। তখন আল্লামা সাঈদী এগিয়ে এসে তাদের সাথে হাত মেলাতেন। এতে কারারক্ষীরা অত্যন্ত আনন্দিত হতো এবং অনেকে মনের আবেগে চোখের পানি ছেড়ে দিত। তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত। প্রাত্যহিক জীবনের মাসালা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে চাইত। আল্লামা সাঈদী খুব সুন্দরভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং কঠিন বিষয়কেও অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তাদের নিয়মিত নামাজ-রোজা ও শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলার জন্য উপদেশ দিতেন। পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথাসহ অনেক বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। নিজের রুম থেকে খাবার এনে তাদের আপ্যায়ন করাতেন। একজন দাঈ ইলান্নাহ হিসেবে ব্যবহারিক জীবনের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করে ইসলামের প্রতি প্রভাবিত করার এরকম ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র বন্দিজীবনে অতুলনীয়—যা সাধারণত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আল্লামা সাঈদীর দাওয়াতি কাজের বড়ো হাতিয়ার ছিল তাঁর সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার। মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক পরিচয় সময়োপযোগী করে

তোলে ধরার জন্য তিনি নিয়মিত জ্ঞানচর্চা করতেন। বাসা, জেলখানা; এমনকি আদালতে যাওয়া-আসার সময়ও ওনার হাতে মহাশত্ৰু আল কুরআন বা বিভিন্ন ধরনের বই লক্ষ করা যেত। ওনার গ্রেফতার হওয়ার কিছুদিন আগের একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। ওই সময় আমার এলাকার মক্কাপ্রবাসী নুরুল ইসলাম ভাই দেশে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লামা সাঈদীর ভক্ত। মক্কা থেকে আসার সময় তিনি আল্লামা সাঈদীর জন্য কিছু হাদিয়া এনেছিলেন। হাদিয়াগুলো দেওয়ার জন্য আল্লামা সাঈদীর শহীদবাগের বাসায় আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালে আমি সানন্দে রাজি হই এবং আল্লামা সাঈদীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করি। আল্লামা সাঈদী আমাদের সন্ধ্যার পর ওনার বাসায় সময় দেন। বাসায় পৌছার পর ড্রইং রুমে কুশলবিনিময় শেষে তিনি আমাদের সাথে একান্তে আলাপ করার জন্য ৫ম তলায় নিয়ে যান। সেখানে একটি কক্ষে আমরা বসার জন্য প্রবেশ করি। বুঝতে পারলাম কক্ষটি ওনার স্টাডি রুম। সুন্দর, পরিপাটি ও গোছানো একটি কক্ষ। টেবিল, চেয়ার ও চারদিকে বুকশেলফ সেট করা। শেলফের ভেতরে সারি সারি রাখা দুর্লভ তাকসির ও হাদিসগ্রন্থের পাশাপাশি রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রের দেশি-বিদেশি লেখকদের লেখা অসংখ্য বই। এই কক্ষে বসে তিনি জ্ঞান-গবেষণা করতেন।

এর কিছুদিন পরে আল্লামা সাঈদী গ্রেফতার হয়ে কারাবাস করছিলেন। আরও পরে আমিও গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যাই। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ নং সেলে যখন আমি আল্লামা সাঈদীর থাকার কক্ষটিতে প্রবেশ করি, তখনই আমার মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে শহীদবাগের বাসার সেই স্টাডি রুমের কথা। কারণ, জেলের এই ছোট্ট কক্ষটির পরিবেশ তিনি এমন করে সাজিয়েছিলেন, যেন এটি সেই স্টাডি রুমেরই একটি ছোট্টো সংস্করণ মাত্র। কক্ষটির এক পাশে শোয়ার বিছানা এবং অপর কোনায় চেয়ার ও পড়ার টেবিল। অধ্যয়নের জন্য তিনি টেবিলের ওপর তাকসির, হাদিসের গ্রন্থ ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি জ্ঞানচর্চার জন্য সব সময় চেষ্টা করতেন, যা জেলখানার ভেতরেও কমতি করেননি। লেখালিখির কাজও অব্যাহত রেখেছিলেন।

জ্ঞানচর্চার এ ধরনের বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে দ্বীনের দাঈ ও মুজতাহিদদের জীবনে লক্ষ করা যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দিন আহমদ ইবনে তাইমিয়া (রাহি.)-এর জেলজীবন সম্পর্কে জানা যায়, কারাগারে বসেও তিনি লেখনীর

কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। নির্জলা সত্যের প্রকাশে তাঁর সামনে কারাখাচীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিরোধী পক্ষ হিংসার আগুনে তাঁকে পুড়িয়ে ছারখার করতে চেয়েছিল। তৎকালীন রাজার হুকুমে কারাগারে তাঁর কাছ থেকে বইপত্র, খাতা-কলম, কালি-দুআত সবকিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবুও তিনি দমে যাননি। ছেঁড়া টুকরো কাগজ জমা করে কয়লা দিয়ে তাতে লেখালিখি করতেন তিনি। এভাবে সত্যের নির্ভীক বীরসেনানী আমৃত্যু লড়ে যেতে থাকেন অসত্যের বিরুদ্ধে। তাঁর সাতষষ্টি বছরের জীবনকাল ছিল মিথ্যা ও বাতিল, অন্যায় ও অসত্যের ন্যাকারজনক পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। এ পথে তিনি কোনো দোৰ্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক ও অসীম ক্ষমতাস্বত্বের প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষুকে একটুও তোয়াক্কা করেননি। আল্লামা সাঈদী ছিলেন এ যুগের এমন একজন সত্যের নির্ভীক বীরসেনানী ও হকের ধারক, যিনি তাঁর পূর্বসূরিদের অনুসরণে কারাগারের বন্দিজীবনেও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মিথ্যা ও বাতিলের পরাজয়ের কাহিনি লিখে গেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের সত্য জ্ঞানের দুটি মূল উৎস। আল্লামা সাঈদী ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে এ মূল উৎস দুটির সাথে সংযুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সব ইলমি যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর লিখিত তাকসিরে সাঈদী-সহ অন্য গ্রন্থগুলোর মাঝে এর প্রমাণ মেলে।

১৪. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দারসে হাদিস

আব্দুল্লাহ সাঈদী জেলখানায় যতটুকু সময় অবসর পেতেন তার বেশিরভাগই পড়ার টেবিলে কাটাতেন। তিনি লেখালিখির পাশাপাশি বন্দিদের মাঝে কৌশলে কুরআন-হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করতেন। আমি ২০১১ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ নং সেলে যাওয়ার পরদিন দুপুরবেলা তিনি আমার রুমে এলেন। ওনার হাতে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কিত লেখা একটি বই ছিল। বইটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—‘বই হলো জেলখানার বড়ো বন্ধু। এটি পড়লে মন ভালো লাগবে, আপনি ভালো থাকবেন।’ বইটি পেয়ে আমি বেশ আনন্দিত হই। কারণ, কারাগারের নিঃসঙ্গ জীবনে সময় কাটানোর একটি সুযোগ তৈরি হয়। তাই ওই দিনই বইটি পড়ে প্রায় শেষ করেছিলাম এবং মনের খোরাক পাওয়ায় পরিতৃপ্ত হলাম। বইয়ের বিষয়বস্তু ও সবেমাত্র কারাজীবনের সূচনার সাথে মিল রেখেই তিনি বইটি আমার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। একজন স্নেহপরায়ণ দায়িত্বশীল হিসেবে জেলজীবনের পরিবেশ বুঝে বই নির্বাচন করা ওনার বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে।

আব্দুল্লাহ সাঈদী কারাগারে ব্যক্তিগতভাবে যেমন দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতেন, তেমনই সহকর্মীদেরও দাওয়াত ইলাহিয়ার কাজে নিয়োজিত করতেন। ওই বছর জেলখানায় যাওয়ার দুদিন পরই তিনি আমাকে ওনার রুমে ডেকে নিয়ে *রিয়াদুস সালাহীন* শিরোনামের বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থের একটি খণ্ড হাতে তুলে দিয়ে বললেন—‘এখানে বন্দিদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন। সুতরাং আমরা আসরের নামাজ আদায়ের পর সময়টিকে দাওয়াতে দ্বীনের কাজে লাগাতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আপনি প্রতিদিন আসরের নামাজের পর একটি করে হাদিস পাঠ এবং এর শিক্ষা পেশ করবেন।’

আমি বললাম—‘আপনি ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের সামনে দারস পেশ করার মতো এত বড়ো সাহস আমার হবে না।’

তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—‘আমি আমীরে জামায়াতের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেছি। আমরা আপনার মাধ্যমে হাদিস পাঠের কাজটি করাতে চাই। আর আমি তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করে থাকি। জুমার খুতবার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করি। তাই আপনি কথা বললে লোকজন নতুন কারও কথা শোনার খোরাক পাবে।’

ওনার মতো মহান ব্যক্তির অনুরোধ এবং আমীরে জামায়াতের নির্দেশ থাকায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আমি প্রায় আড়াই মাস ভিআইপি বন্দিদের সামনে প্রতিদিন আসরের নামাজ আদায়ের পর হাদিসের দারস পেশ করেছি। নামাজের পর সকল বন্দি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগের সাথে নিয়মিত হাদিসের দারস শুনতেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা কাশিমপুর কারাগার থেকে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে আদালতে হাজিরার জন্য ২৬ নং সেলে আনা হয় (যিনি পরবর্তী সময়ে রাজশাহী কারাগারে বন্দি অবস্থায় ইন্তেকাল করেন)। পরদিন আদালতে হাজিরা শেষে তিনিও আসরের নামাজের পর হাদিসের দারস শোনেন। সেদিন হাদিসের দারসের বিষয়বস্তু ছিল—‘টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানের শাস্তি’।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার পরিধেয় কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে চলাফেরা করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না।” বুখারি : ৩৬৬৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেন—

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُفَّينِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ.

“লুঙ্গির (বা পাজামা বা প্যান্টের) যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে।” বুখারি : ৫৭৮৭

এই হাদিস শোনার পর শ্রোতাদের মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল। এ প্রসঙ্গে আমি দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই—

এক. পরদিন দুপুরের পর নাসির উদ্দিন পিন্টু সাহেব জেলখানার দর্জি দোকান থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে আসেন। প্রথমে নিজের প্যান্টগুলো কেটে ছোটো করেন। এরপর তিনি ওই দর্জিকে সাথে নিয়ে ২৬ নং সেলের সকলের রুমে গিয়ে অনুরোধ করেন, গতকাল দারসে যে হাদিসটি পেশ করা হয়েছে, এর ওপর আমল করার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একজন দর্জি নিয়ে এসেছি। যাদের প্যান্ট-পায়জামা টাখনুর নিচে আছে, তারা ইচ্ছা করলে ছোটো করে নিতে পারেন। এ কথা শোনার পর যাদের প্যান্ট-পায়জামা টাখনুর নিচে ছিল, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আহ্বানে সাড়া দেন। এই মহৎ সওয়াবের কাজটি করতে পেরে নাসির উদ্দিন পিন্টু নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং আমার রুমে এসে এ বিষয়ে হাদিস পেশ করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর আসরের নামাজের সময় হলে সবাই নামাজ আদায় করতে আসেন। সেখানে নামাজের পর একটি কঠিন গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখতে সহযোগিতা করার জন্য অনেকে নাসির উদ্দিন পিন্টুকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর আল্লামা সাঈদী সাহেব আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন এবং সকলের জন্য দুআ করেন।

দুই. ওইদিন সকালে নাশতার পর আমি বারান্দায় বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। তখন সাবেক আইজি শহিদুল হক সাহেব আমার পাশে বসে বললেন—‘আমি সাঈদী সাহেবের জুমার খুতবা ও প্রতিদিন আসরের নামাজের পর আপনার উপস্থাপিত হাদিসের দারস অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং বোঝার চেষ্টা করি। এখানে এসে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আপনাদের সাথে আমার আরও আগে যোগাযোগ হলে অনেক বেশি উপকৃত হতে পারতাম।’

ওনার মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মাঝে এ পবিত্র অনুভূতি দেখে আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি এবং ওনাকে নিয়মিত কুরআনের তাফসির, হাদিসগ্রন্থ ও ইসলামী সাহিত্য পড়ার মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ প্রদান করি। এরপর তিনি আমাদের কাছ থেকে কুরআন-হাদিস ও কয়েকটি ইসলামী সাহিত্য সংগ্রহ করে নিয়মিত পড়াশোনা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালে কাশিমপুর-২ নং কারাগারে ওনার সাথে আমার দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎ হয়। সেখানেও আমরা একই ভবনে থাকতাম। একসাথে নামাজ আদায় করতাম। ওই সময়ে আমি লক্ষ করেছি, তিনি ২০১১ সালে তৎকালীন

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে যেভাবে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন, তা অব্যাহত রেখেছেন। তখন তিনি প্রায় সময় কুরআনের একটি তাকসির নিয়ে আমার সাথে আলোচনায় বসতেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত ও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করতেন। এতে বোঝা যায়, জেলখানার বন্দিজীবনকেও জ্ঞান অর্জন ও চরিত্র গঠনের জন্য উত্তমভাবে কাজে লাগানো যায়।

১৫. তাহাজ্জুদের এক জান্নাতি পরিবেশ

আল্লামা সাঈদী একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও একজন তাকওয়াবান ও আল্লাহ তায়ালায় মুহসিন বান্দা ছিলেন। আমি ওনার সাথে কারাগারে থাকাকালে দেখেছি, গভীর রাতে সৃষ্টিজগতের প্রাণিকুল যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তিনি তখন আল্লাহ তায়ালায় সান্নিধ্য লাভের জন্য ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হতেন। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন। শেষ রাতের জায়নামাজে আল্লামার গুনগুন কান্নার শব্দে কেউ কেউ জেগে উঠত। জেগে ওঠা বন্দিরাও তাহাজ্জুদে शामिल হওয়ার প্রস্তুতি নিত। তাদের প্রস্তুতির টুংটাং শব্দে অন্যরাও জেগে উঠত। এভাবে প্রায় সকলেই উঠে নিজ নিজ কক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে আল্লাহ তায়ালায় কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করত। এর ফলে জেলখানার তালাবদ্ধ প্রতিটি কক্ষে রাতের অন্ধকারে কান্নার রোল পড়ে যেত। নির্জন কারাগারে তখন অপূর্ব এক জান্নাতি পরিবেশ বিরাজ করত।

আমার জেলে যাওয়ার প্রথম দিন গভীর রাতে এ দৃশ্যের অবতারণা হলে আমি ভয় পেয়ে যাই। এত রাতে কান্নার আওয়াজ কেন? একটু মনোযোগ দিয়ে গুনতে পাই, আল্লামা সাঈদী নিজ কক্ষে বিনয়ী সুরে কান্নারত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালায় কাছে দুআ করছেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

এটুকু বলার পর তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন— رَبِّ اغْفِرْ لِي - “হে রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন।”

উল্লেখ্য, বান্দা যখন গভীর রাতে মহান আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় এবং প্রশংসা করে বলবে—‘রাব্বিগফিরলি’, তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করে দেন; তাকে রহমত, বরকত ও নাজাত দান করেন।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর এই আমল মূলত সেই হাদিসেরই অনুসরণ-যা বর্ণিত হয়েছে উবাদা ইবনু সামিত রা.-এর সূত্রে। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ دَعَا رَبَّ اغْفِرْ لِي غُفِرَ لَهُ .

“যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে (এই দুআ) পড়বে—وَحْدَهُ—
 لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ—(আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ মহাপবিত্র! আল্লাহই সকল প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সুমহান। মহান আল্লাহর দয়া ছাড়া মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার কিংবা ভালো কাজ করার শক্তি কারও নেই)। অতঃপর সে যদি বলে—رَبِّ اغْفِرْ لِي—(হে রব! আমাকে ক্ষমা করো), তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” বুখারি : ১১৫৪

প্রিয়নবী সা., সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহ তায়ালায় সান্নিধ্য প্রত্যাশী মনীষীগণ রাতের শেষাংশ তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর মাধ্যমে কাটাতেন। যেসব পুণ্যবান বান্দা গভীর রজনিতে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালায় ইবাদতে মশগুল হয়, মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশংসা করে বলেন—

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ الْأَنْبَاءِ النَّبِيِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَزْجُو أَرْحَمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩٩﴾

“যে ব্যক্তি গভীর রজনিতে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদতে মশগুল হয়, পরকালের ভয় রাখে এবং তার রবের অনুগ্রহ কামনা

করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।” সূরা যুমার : ৯

সেদিন গভীর রাতের ঘটনাটি স্পষ্ট হওয়ার পর আমিও বিছানা থেকে উঠে নিজ কক্ষে আবদ্ধবস্থায় ইবাদতে शामिल হই। সেখানে যতদিন বন্দি ছিলাম, আত্মশুদ্ধির এই সুন্দর ও পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ লাভ করি। আসলেই জেলখানা মুমিনদের জন্য ইবাদত-বন্দেগি ও আল্লাহ তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মহাসুবর্ণ সুযোগ। বলতে গেলে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প বা শিক্ষাশিবির। মুমিন বিপদ চেয়ে নেয় না বটে, কিন্তু বিপদ যখন চলে আসে, তখন তাকে নিয়ামতে পরিণত করার শিল্প আল্লাহর নেক বান্দাদের জানা আছে।

আল্লামা সাঈদীর ইবাদত-বন্দেগির এ ধারা ওনার জীবনের শেষ মুহূর্তেও লক্ষ করা গেছে। তিনি আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কাশিমপুর ১ নং কারাগারের একটি ছোট্ট কক্ষে বন্দি ছিলেন। সেখানে গত ১৩ আগস্ট, ২০২৩ রোববার বুকে ব্যাথা অনুভব করলে বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে প্রথমে কারা হাসপাতাল এবং পরে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। উক্ত হাসপাতালে কর্মরত সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. মুক্তাদির হোসাইন ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন—যাতে আল্লামা সাঈদীর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদতের প্রতি একনিষ্ঠতার সাক্ষ্য মেলে। ফেসবুকে ডা. মুক্তাদির হোসাইন লিখেছেন—

“সিসিইউতে কর্তব্যরত থাকায় আমার ওপর সাঈদী হজুরের চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে ওনাকে বিএসএমএমইউতে রেফার্ড করেছিলাম। এরই মধ্যে মাগরিবের আযান শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নামাজ দাঁড়ালেন। অজু আছে এমন কেউ উনার সাথে জামায়াতে শরিক হয়ে নামাজ পড়তে চায় কি না বলার পর একজন পুলিশকে নিয়ে দুজন মিলে নামাজ পড়লেন। চিকিৎসা ও বিভিন্ন কথাবার্তা শেষে সিভিল সার্জন স্যারসহ সিনিয়র সকল স্যারগণ দুআর আদান-প্রদান করে ঢাকায় রেফার্ডপূর্বক উনাকে বিদায় দিয়েছেন। আমি আমার জন্য ও আমার পুত্রের জন্যও আলাদাভাবে দুআ চেয়েছি।

উনার প্রতি সব স্যারদের, পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কারা কর্তৃপক্ষের লোকজনের অত্যধিক শ্রদ্ধা ও বিনয় দেখে অনেকটাই অবাক হয়েছি। সিনিয়র সব স্যার এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত সম্মানের সাথে সাঈদী হজুরকে ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করেছেন।

সাঈদী হজুর সিভিল সার্জন স্যারের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন— ‘বাবা, তোমার প্রতি এবং সবার প্রতি আমার কেবল একটাই উপদেশ, তোমরা কেউই নামাজ ছাড়বা না। কখন কার মৃত্যুর ডাক পড়ে যাবে তার কোনো ঠিক নাই। কেউই নামাজ ছাড়বে না, তোমরা বাবারা।’ সিভিল সার্জন স্যার বললেন— ‘স্যার, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আমার জন্য দুআ করবেন।’ সাঈদী হজুর বললেন— ‘অবশ্যই দুআ করব, তোমরাও আমার জন্য দুআ করবে।’ সিভিল সার্জন স্যার ও আমি কাউন্সেলিং শেষে ঢাকায় রেফার্ডের কথা জানালে হজুর বললেন— ‘ঢাকায় নেওয়া লাগবে না। আমাকে আমার কক্ষে পৌঁছে দাও। আমি নিভূতে আল্লাহর ইবাদত করতে চাই। তোমরা আমার থাকার জায়গায় পৌঁছে দাও, অন্য কোথাও পাঠানোর (রেফার্ডের) প্রয়োজন নেই। আমি নিভূতে ইবাদত করতে চাই।’ ধীরে ধীরে এ কথাগুলো কয়েকবার বলেছেন। রুমে এত মানুষ থাকার পরও স্বল্প সময়ে হজুরের কথাবার্তায় ও আচরণে এক পিনপতন নীরবতার মতো সম্মোহনী পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

এর আগে আমার কখনও হজুরের এত কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। এতদিন শুধু মানুষের কাছে শুনেছি। চিকিৎসা দিতে গিয়ে এগুলো স্বচক্ষে অবলোকন করলাম রোববার সন্ধ্যায়। দলমত, ধর্ম-বর্ণ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মচারী নির্বিশেষে সকল মতাদর্শের মানুষ কীভাবে একটা মানুষের এতো ভক্ত হতে পারে, তা ভেবে পাই না। তবে এক ঘণ্টার মধ্যেই হজুরের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের যে প্রখর প্রভাব দেখলাম এবং এত অসুস্থতা ও ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক নিয়েও যে কনফিডেন্স, মানসিক শক্তি আর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল লক্ষ করলাম, তা হয়তো ওনার মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আল্লাহ ওনাকে ও আমাদেরকে জ্ঞানাত নসিব করুন, আমিন!”

১৬. আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা

আব্দুলাম সাঈদীর (রাহি.) কারাজীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও বেদনাবিধুর। ২০১০ সালে তথাকথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে তিনি কারাবন্দি হন। তখন ওনার বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। হাটে পাঁচটি রিং পরানো ছিল। ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপসহ নানা জটিল রোগে তিনি ভুগছিলেন। এরূপ বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে তিনি বন্দিজীবনের ভয়াবহতাকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছেন। ক্ষমতাসীন ইসলামবিরোধী জালিম সরকারের দায়েরকৃত বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ৯৩ দিন রিমান্ডে থাকাকালে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। রিমান্ডে দিনের পর দিন নির্জন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একাকী সময় কাটিয়েছেন। এ সময় সরকার বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে ওনাকে মানসিকভাবে অত্যাচার করে। এত কিছুর পরও আব্দুলাম সাঈদী ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পথে আপসহীন। আদর্শ ও সংগঠনের প্রতি ছিল তাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্য। ওই সময় জালিম শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করলে বাকি জীবন তিনি সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারতেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের এ অকুতোভয় সৈনিক দুনিয়ার সকল লোভ-লালসা ও সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তে আব্দুলাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি জেলখানায় আমার সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপচারিতার মাঝে কারাজীবনের সেই ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছিলেন। এখানে আমি এর উল্লেখযোগ্য কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আব্দুলাম সাঈদী ২০১০ সালে গ্রেফতার হওয়ার প্রথম দিকের ঘটনাবলি ছিল অত্যন্ত নির্মম, জঘন্য ও বর্বরোচিত। ওনার ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁকে প্রথমবার সিআইডিতে রিমান্ডে এনে টানা চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। তখন খাওয়াদাওয়া, নামাজ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে গভীর অন্ধকারে। ওনাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য সেখানে নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

এত জুলুম ও নির্যাতন চালানোর পরও ফ্যাসিস্ট শক্তি যখন আল্লামা সাঈদীকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি, তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। রিমান্ড চলাকালে ওনার কয়েকজন নিকটাত্মীয়কে ডেকে এনে একটি লোভনীয় প্রস্তাব দেয় সরকার। প্রস্তাবটি হলো—‘তিনি জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ করে দেশের আলেম-উলামা এবং জামায়াতে ইসলামীতে যারা ওনার ভক্ত আছেন, তাদের নিয়ে নতুন একটি পৃথক ইসলামী দল গঠন করবেন। এ প্রস্তাবে রাজি হলে সরকার ওনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করে বন্দিজীবন থেকে মুক্তি দেবে। সেইসাথে দল পরিচালনার জন্য সরকার যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।’

তিনি এ প্রস্তাবের জবাবে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন—

“এ ধরনের ঘৃণিত প্রস্তাব আমি গ্রহণ করব—এ ধারণা তাদের কীভাবে হলো? আপনারা তাদের জানিয়ে দেবেন—আমার জীবনে যত সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি, সুনাম ও মানুষের ভালোবাসা অর্জিত হয়েছে, এর সবকিছু আল্লাহ তায়ালার কুরআন এবং জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি ধীনি সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই হয়েছে। আর এ কারণেই আমি সকলের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি হক ও পূর্ণাঙ্গ ধীনি সংগঠন ত্যাগ করা আমার জন্য কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে অত্যাচারী শাসকের সহযোগী হয়ে আরামের জিন্দেগির চেয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথে আমার পূর্বসূরীদের অনুসরণে কারাগারে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে শাহাদাতের মৃত্যুকে আমি শ্রেয় মনে করি।”

আল্লামা সাঈদী জেলখানায় থাকাকালীন আমাকে যখন এ কথাগুলো বলছিলেন, তখন আমি কথাগুলো অবাক-বিস্ময় হয়ে শুনছিলাম।

অতঃপর আল্লামা সাঈদী মনের আবেগ দিয়ে ইমামে আযম আবু হানিফা (রাহি.)-এর কারাগারে কষ্টে মোড়ানো জীবনের একটি খণ্ডচিত্র আমাকে বর্ণনা করে শোনান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—খলিফা আবু জাফর মানসুরের সময় সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমামে আযম আবু হানিফা (রাহি.)। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান জ্ঞানতাপস ও হকের ধারক আলেম। ৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মানসুর তার ক্ষমতার স্বার্থে ইমাম আবু হানিফাকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। ইমাম আবু হানিফা উক্ত প্রস্তাব

ফিরিয়ে দিয়ে খলিফাকে বলেন—‘আল্লাহর শপথ! কোনো ব্যাপারে আমার ফয়সালা যদি আপনার বিরুদ্ধে যায় এবং আপনি আমাকে হুকুম দেন যে হয়তো সিদ্ধান্ত পালটাও, না হলে তোমাকে ফোরাতে নদীতে ডুবিয়ে মারা হবে, তখন আমি ডুবে মরতে প্রস্তুত থাকব, তবু সিদ্ধান্ত পালটাতে পারব না। তা ছাড়া আপনার দরবারে এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদের মনোভূষ্টি করার মতো কাজীর প্রয়োজন।’

খলিফার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন এই অপরাধে ইমাম আবু হানিফাকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করা হয়। বেত্রাঘাতের ফলে ইমামের সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। এ সময়ে ইমাম আবু হানিফার বয়স ছিল সত্তর বছর। শেষ পর্যন্ত নিজের মতে অটল থাকায় তাঁকে কারারুদ্ধ করে পানাহারে কষ্ট দেওয়া হয় এবং নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। ওই সময় তিনি আট বছর পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—‘ইমাম সাহেব! দীর্ঘদিন ধরে জেলের মধ্যে আছেন, কষ্ট হয়?’ তিনি জবাবে বলেছিলেন—‘না, কষ্ট হয় না। তবে মাঝে মাঝে মনে একটু কষ্ট হয়। দুই-চার মাস পরপর আমার অশিীপদ বৃদ্ধা মাকে জেলখানায় হাজির করিয়ে তাঁর সামনে আমাকে পেটানো হয়। ছেলেকে পেটানোর দৃশ্য দেখে বয়োবৃদ্ধা মা যেন আমাকে বলে, এদের সাথে একমত হয়ে যাও। সেজন্য আমাকে মায়ের সামনে পেটানো হয়। কিন্তু তাদের পেটানো দেখে আমার মায়ের চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। তখন আমার মনে কষ্ট লাগে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমার মা এমন এক মহীয়সী নারী, যিনি আমার ওপর তাদের নির্মম প্রহার দেখে হজম করেন। আর আমাকে বলেন—খবরদার! সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়বা না।’

আল্লামা সাঈদীর স্বভাবসুলভ আবেগাপ্ত ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে এই ঘটনার বিবরণ আমার মনে অন্যরকম প্রেরণা সঞ্চার করে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করি, যুগে যুগে যারা ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেই সকল দ্বীনের মুজাহিদ ও মুজতাহিদগণ এক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য উজ্জ্বল নজির স্থাপন করে গেছেন। আর বর্তমান যুগের দাঈ, আলেম ও মুজাহিদগণও আজ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং একই দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন।

আল্লামা সাঈদীকে জামায়াতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা নতুন নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৮৭ সালের আরেকটি ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা তুলে ধরেন। মূল ঘটনা বলার আগে তিনি প্রথমে পেছনের ইতিহাস দিয়ে কথা শুরু করেন—

“বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে ১৯৭৭ সালে লন্ডনে আমার দেখা হয়। সেখানে দেশের পরিস্থিতি ও ইসলামপন্থীদের ঐক্য সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি আমাকে বলেন—‘বাংলাদেশে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করতে হলে অসংগঠিত ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।’ এ লক্ষ্যে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের ব্যাপারে একটি ফর্মুলা নিয়ে তিনি আমার সাথে পরামর্শ করেন (ওনার ফর্মুলাটি পরে ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়)। তাঁর এ ফর্মুলা আমার পছন্দ হওয়ায় তিনি আমাকে পরামর্শ দেন—‘আপনার মাহফিলসমূহে বহু আলেম-উলামা উপস্থিত থাকেন। সম্ভব হলে আপনি মাহফিলের শেষে আলেমদের সাথে বৈঠক করে এ ফর্মুলা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।’

এরপর দেশে ফিরে আমি খ্যাতনামা উলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা শুরু করি এবং সারা দেশে অনুষ্ঠিত তাফসিরুল কুরআন মাহফিলে এ বিষয়ে ইসলামপ্রিয় জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকি। এতে কওমি ও আলিয়া উভয় নিসাবের উলামা-মাশায়েখসহ সকল দ্বীনি মহলের সাড়া পাওয়া গেলে আমি বেশ উৎসাহবোধ করি। এ পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের পরামর্শ ও নির্দেশনার আলোকে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখের উদ্যোগে ‘ইন্সেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ’ নামে ব্যাপকভিত্তিক একটি ইসলামী ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়। সকল মত ও পন্থার আলেমসমাজের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, ইসলামদরদি ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা এবং ইসলামপ্রিয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকায় সারা দেশে ইসলামী ঐক্যের পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্বীপনা দেখা দেয়। তখন আমি ইন্সেহাদুল উম্মাহর অগ্রগতি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে একাধিকবার বলেছি—‘আপনি এমন এক চমৎকার ফর্মুলা দিয়েছেন, যার ফলে এ সংগঠনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব নয়; বরং সামষ্টিক নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে। আর অরাজনৈতিক সংগঠন হওয়ায় এতে কোনো দলাদলির আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না।’”

সেদিন আনন্দঘন পরিবেশে একপর্যায়ে কথাগুলো বলার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যান। অতঃপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাতর কণ্ঠে তিনি বলেন—

“কিছু লোকের ভুলের কারণে দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৮৬ সালের শেষদিকে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। যার ফলে ইন্তেহাদুল উম্মাহ হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ ছয়টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠা যে ইসলামী ঐক্যমঞ্চের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেটি এভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবে, তা কখনও ভাবিনি। তখনকার ঘটনাটি মনে পড়লে আমি যতটা ব্যথিত হই, অন্য কোনো ঘটনায় এত কষ্ট পাই না।”

অতঃপর তিনি বলেন—

“ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে মজলিসে সাদারাতের এক বৈঠকে বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে সারা দেশের জনগণের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। মানুষের মধ্যে ব্যাপক ইসলামী জয়বা দেখে ইন্তেহাদুল উম্মাহর নেতৃবৃন্দ আন্দোলন আরও জোরদার করার পরিকল্পনা করেন এবং একটি বিদেশি দূতাবাসের কিছু লোক এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। তারা এ আন্দোলনকে সহযোগিতার কথা বলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তাদের দূতাবাসে বৈঠকের আয়োজন করে। সেই বৈঠকে ইন্তেহাদুল উম্মাহর কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করে। একই সাথে সেদিন কে কে বক্তব্য রাখবেন, সেই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাফসিরুল কুরআন মাহফিলগুলোয় সকল শ্রেণির মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি ও ইসলামী জনতার জয়বাকে বিবেচনা করে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবির আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য তারা আমাকে বাছাই করেছিলেন। তারা আমাকে নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত করার জন্য একটি সুন্দর যুক্তি আমার সামনে পেশ করে। তাদের যুক্তি ছিল—‘দেশের জনগণ ইসলাম চায়। আপনার মাহফিলে যেকোনো সময় দলে দলে নারী-পুরুষ পরম

আবেগ নিয়ে হাজির হয়। তারা মাহফিলে আল কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো শ্লোগান শেখে এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় এ শ্লোগানটি দিতে দিতেই যায়। কুরআনের শাসন কায়েমের দাবিতে তাদের আপনি ডাক দিলে তারা জান দিতেও পরোয়া করবে না। ফলে কোটি কোটি তাওহিদি জনতা পাগলপারা হয়ে এ আন্দোলনে শরিক হবে এবং এ আন্দোলনের ফসল জামায়াতে ইসলামীর ঘরেই উঠবে। জনগণের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জনশক্তি যেহেতু জামায়াতই তৈরি করেছে, তাই এর ফসল অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। জনগণ আন্দোলনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখন আর বিলম্ব করা চলে না।”

কিন্তু এ কথার আড়ালে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তারা জামায়াতকে বাদ দিয়ে আল্লামা সাঈদীকে সামনে রেখে নতুন একটি প্ল্যাটফর্মের পরিকল্পনা করেছিল, যার মাধ্যমে আল্লামা সাঈদী জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের এ পরিকল্পনা জানার পর জামায়াতে ইসলামী ৩১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা এক জরুরি অধিবেশন আহ্বান করে। মজলিসে শূরার অধিবেশনে তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন—

“আমাদের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা জনশক্তি মাওলানা সাঈদীকে মহক্বত করেন। তাই মজলিসে শূরাকে এ সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, যাতে জনশক্তিকে ডিল করতে সমস্যা না হয়। এখন মাওলানা সাঈদী সফরে আছেন। তিনি ফিরে এলেই তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হবে। সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের যে প্রমাণ এ পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি জামায়াতের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি যখনই জানতে পারবেন যে জামায়াত ও শিবির ওই নতুন আন্দোলনে शामिल হবে না, তখনই তিনি বিরত হয়ে যাবেন। যারা তাঁকে এ পথে এতদূর টেনে নিয়ে গেছেন, তাদের ত্যাগ করে ফিরে আসতে তিনি এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবেন না বলে আশা করা যায়। তবুও খোদা না করুন, যদি এ আন্দোলন গুরু হয়ে যায় এবং তিনি তাতে শরিক থাকেন, তাহলে আমাদের জনশক্তি যেন নীরবে তাতে শরিক হওয়া থেকে বিরত থাকে। এর চেয়ে বেশি কোনো প্রতিক্রিয়া যেন কেউ না দেখায়।”

সবাইকে এতটুকু অবহিত করেই শূরার জরুরি অধিবেশন সমাপ্ত করা হয়। তবে এখানেই ঘটনাটি শেষ হয়নি। সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম (রাহি.)-এর বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস বইয়ের ৩৯-৪০নং পৃষ্ঠায় পরবর্তী ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নরূপ—

“১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যেদিন ‘আগামীকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ইন্সেহাদুল উম্মাহর প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে’ বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো, সেদিন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে একান্তে কথা বললেন। মাওলানা ইউসুফ মাদরাসায় মাওলানা সাঈদীর শিক্ষক ছিলেন। তদুপরি তিনি তখন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল। এ কারণেই জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীর সাথে আলোচনা করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল।

উভয়ের মধ্যে যে আন্তরিক মহক্বতের সম্পর্ক রয়েছে, সে পটভূমিতে মাওলানা ইউসুফ কোনো কৈফিয়ত তলব না করে শুধু এটুকু কথা জানিয়ে দিলেন—‘আগামীকাল প্রেস কনফারেন্স করে যে আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার কথা রয়েছে, তাতে আপনি যদি শরিক হন, তাহলে তা আপনার নিজস্ব ফয়সালা। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে এ আন্দোলনে আপনার সাথে পাবেন না। কারণ, জামায়াত এ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। আপনি আজীবন জামায়াত ও শিবিরের সাথে ইসলামী আন্দোলন করে এসেছেন, এখন জামায়াত ও শিবিরকে বাদ দিয়ে এ আন্দোলনে যাবেন কি না, চিন্তা করে দেখুন।’ এ সিদ্ধান্ত জানার পর মাওলানা সাঈদীর এক মিনিটও বিলম্ব হলো না। তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলেন—‘জামায়াত ও শিবিরকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।’

আমরা তাঁর কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্য নিরঙ্কুশ বলেই আমরা জানতাম। তিনি জামায়াত ও শিবিরকে ছেড়ে গেলে যে এ ময়দানে কিছুই করতে পারতেন না, এমনও নয়। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে একটা আন্দোলন অবশ্যই তিনি খাড়া করতে পারতেন। কিন্তু এ

আন্দোলনের ফসল জামায়াতের ঘরে উঠবে বলে যে ধারণা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তা যে হবে না—এ কথা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়নি।

সারা দেশে আল্লাহ তায়াল্লা তাঁকে যে বিশাল জনপ্রিয়তা দিয়েছেন, তাতে তিনি যেকোনো সময় ইচ্ছা করলে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন। তবে তিনি জামায়াতের পুরোনো রুকন হিসেবে খুব ভালো করেই জানেন, জামায়াত যে পদ্ধতিতে সংগঠন পরিচালনা করে এবং যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে—এমন সংগঠন করা খুবই কঠিন কাজ। তাই তিনি সংগঠনের আনুগত্যে কোনো সময়ই দুর্বলতা দেখাননি। পরের দিন জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা। মাওলানা সাঈদী সেখানে যাবেন না বলে আমরা নিশ্চিত হলাম। সেখানে কী ঘটবে, সে বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য অবশ্যই ছিল।

সেদিন সকাল ১০টায় হঠাৎ বেগম সাঈদী আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমি রীতিমতো অপ্রস্তুত। তিনি পেরেশান হয়ে বলতে লাগলেন—‘একদল লোক মাওলানা সাঈদীকে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য একটি আন্দোলনের নেতৃত্বে তাঁকে অধিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। গতকাল মধ্যরাত পর্যন্ত তারা আমাদের বাড়িতে তাঁর কাছে ধরনা দিয়েছে। আপনি তাঁকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচান।’

আমি ধীরকণ্ঠে বললাম—‘ভাবি! আপনি পেরেশান হবেন না। তিনি ওদের সাথে যাবেন না বলে গতকালই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’ আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম যে, বেগম সাঈদী এতটা রাজনীতিসচেতন কেমন করে হলেন? তিনি তো সংগঠনেও তেমন কোনো দায়িত্বে নেই। অথচ এ সময় মাওলানা সাহেবকে কতক লোক জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করছে বলে কেমন করে বুঝতে পারলেন? আমি তাঁর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হলাম।”

উপরিউক্ত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার সূচনা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগেই হয়েছে। কিন্তু তা সূচনাপর্ব পার হয়ে বিকাশ পর্যায়ে আসামাত্রই একটি মহল জামায়াতকে বাদ

দিয়ে এবং আল্লামা সাঈদীর জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নামে ইসলামী শক্তির একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এজন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে ওনার সামনে ওপরে বর্ণিত যুক্তিটি পেশ করেছিল। যুক্তিটি বেশ আকর্ষণীয় হলেও এর নেপথ্যে যারা কাজ করেছে, তাদের পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী ও নেতিবাচক। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আল্লামা সাঈদীকে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক একটি ইসলামী দল গঠন করা—যাতে জামায়াতে ইসলামী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দুই দফা আল্লামা সাঈদীকে জামায়াতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্নের চেষ্টা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আল্লামা সাঈদীর ও তাঁর পরিবারের জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা এ সকল অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয়।

ইসলামবিরোধী শক্তির সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা শেষ অস্ত্র হিসেবে তথাকথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (বাংলাদেশ)-এর মাধ্যমে মিথ্যা মামলায় সাজানো রায়ে ফাঁসি দিয়ে আল্লামা সাঈদীকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে। কিন্তু শত ষড়যন্ত্র করেও আল্লামা সাঈদীকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনাও সফল হয়নি।

১৭. আল্লাহর ঘর ও

রাসূল সা.-এর রওজার প্রতি আবেগ

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার লোভ-লালসা, ভয়ভীতি ও নানা রকম কূটকৌশলের মাধ্যমে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আদর্শচ্যুত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লামা সাঈদীর ইমানি শক্তি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট এত গভীরে প্রোথিত—যা অন্য কোনোভাবে দুর্বল করা সম্ভব নয়। এ কারণে ইসলামবিরোধী অপশক্তি তাদের পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ওনাকে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

২০১১ সালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে তথাকথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (বাংলাদেশ) যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ দায়ের করে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের গল্প ও কাহিনি সাজিয়ে বিচারের নামে হয়রানি করে। দীর্ঘ ১৩ বছর পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তাঁকে কারাগারে দুর্বিসহ জীবনযাপনে বাধ্য করে। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে কারাগারে বন্দি থাকাকালে সকাল সকাল আদালতে হাজিরা দিতে যাওয়া এবং সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত শরীরে ফেরা ছিল তাঁর নিত্যদিনের ঘটনা। তারপরও তাঁকে কখনও বিচলিত দেখা যায়নি। ইমানি শক্তিতে বলীয়ান ধীরের এ মুজাহিদ সকল কষ্ট, দুঃখ-বেদনা মনের গভীরে চেপে রেখে সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃঢ় ইমান ও তাওয়াক্কুল তাঁকে সব সময় উজ্জীবিত রাখত।

কারাজীবনে কারাবন্দিদের জন্য আল্লামা সাঈদী ছিলেন অনুপ্রেরণার প্রতীক। কারাভ্যন্তরে কর্মরত সকলের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ব্যক্তিত্ব। ২০১১ সালের শেষ দিকে গ্রেফতার হওয়ার পর প্রায় আড়াই মাস ওনার সাথে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন সেখানে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও কারাবন্দি ছিলেন।

ওনাদের সান্নিধ্যে থেকে আমি নিজের জীবনের জন্য অনেক পাথেয় অর্জন করেছি। এটি নিশ্চিত যে, অনেক স্মৃতিবিজড়িত সেই অমূল্য সময়গুলো আমার জীবনে আর কখনও ফিরে আসবে না। তবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারের ঘটনাবলি স্মৃতির পাতায় যখন ভেসে আসে, তখন আমি আবেগাপ্ত হয়ে পড়ি এবং সেখান থেকে প্রেরণা লাভ করি—যা আমাকে পথ চলতে শক্তি জোগায়।

পুরান ঢাকার সুউচ্চ দেয়ালঘেরা এ কারাগার ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো কারাগার এবং ইতিহাসের হাজারো ঘটনাবলির নীরব সাক্ষী। একসময়ের মোঘল দুর্গটি ১৭৮৮ সালে সংস্কার করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কারাগারে রূপান্তর করে। তৎকালীন পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে অনেক রাজবন্দি এ কারাগারে তাদের জীবনের মূল্যবান সময় কাটিয়েছেন। ২০১৬ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখ কেরানীগঞ্জে নতুন করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ করা হলে ২২৮ বছরের পুরোনো এ কারাগারকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

৩৮ একর জায়গার ওপর বিস্তৃত এ কারাগারের খারণক্ষমতা সাড়ে ছয় হাজার হলেও সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে দ্বিগুণ-তিন গুণ বেশি কারাবন্দি সেখানে অবস্থান করত। এতে থাকা-খাওয়া, গোসল, শৌচাগার, রাতে ঘুমানো ও চিকিৎসাসহ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধার অভাবে চরম কষ্টে জীবনযাপন করতে দেখেছি বন্দিদের।

ঐতিহ্যবাহী পুরান ঢাকার এ কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিম-দক্ষিণ কর্ণারে ২৬ নং সেল অবস্থিত। সেখানে শ্রেণিপ্রাপ্ত বন্দিদের আটক রাখা হতো। চারদিকে বাউন্ডারি ঘেরা পৃথক এলাকায় এ সেলে পৃথক একটি গেট আছে। এ গেট দিয়ে সেখানে আটক বন্দিগণ চলাচল করত। ভেতরে ভিআইপি বন্দিদের থাকার জন্য পৃথক আটটি কক্ষ, সামনে লম্বা বারান্দা ও কর্ণারে একটি পাকের ঘর। বন্দিদের হাঁটাচলার জন্য ছিল সরু একটি রাস্তা। ওই সময়ে যারা বন্দি ছিলেন অধিকাংশই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। তাই শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য এ রাস্তা দিয়ে সকাল-বিকাল তারা হাঁটাইটি করতেন।

আল্লামাকে নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে হতো। তাই তিনি সকালে হাঁটার সুযোগ পেতেন না। এজন্য তিনি প্রতিদিন বিকালবেলা ওই রাস্তায় হাঁটতেন। আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন ওনার হাঁটার সঙ্গী হতাম। হাঁটার সময় দুজনে

বিভিন্ন ধরনের আলাপ-আলোচনা করতাম। আলোচনার সময় লক্ষ করতাম, ওনার মাঝে সব সময় দুটি আকাজক্ষা প্রবলভাবে কাজ করত। ওনার বর্ণনা অনুযায়ী এর একটি হলো—

“আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এখন থেকে নাজাত দান করেন, তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও রাসূল সা.-এর রওজা জিয়ারত করা।”

এ কথা বলতে বলতে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

“ওই দেখেন, একটি পাখি মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখিটির মতো আমি যদি উড়াল দিতে পারতাম, তাহলে আল্লাহর ঘর কাবায় এবং মদিনায় রাসূল সা.-এর রওজায় চলে যেতাম। কিন্তু এখন আমি জালিমের খাঁচায় বন্দি। গত দুই বছর চলে গেল আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, নামাজ ও ইতিকাফ এবং নবীজির রওজার পরশ থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বিশেষ করে বছর ঘুরে রমজান মাস এলে আমার হৃদয়-মন কেঁদে ওঠে।”

আল্লামা সাঈদী জীবনের দীর্ঘ সময় রমজানের শেষ দশক হারাম শরিফের অভ্যন্তরে ইতিকাফ করেছিলেন। সেদিন ইতিকাফকালীন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কাবাঘর ও মদিনায় রাসূল সা.-এর রওজা মুবারকের প্রতি ওনার এত গভীর অনুভূতি দেখে আমি অভিভূত হলাম। পরে কুরআন-হাদিস থেকে এ বিষয়ক অধ্যয়নকালে এমন হৃদয়াবেগ ও গভীর অনুভূতির উৎসসূত্র খুঁজে পেলাম। কাবাঘরের মর্যাদা প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন—

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرُوا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য সম্মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম)— ‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করবে।’

আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম—‘তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।’” সূরা বাকারা : ১২৫

দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদা ও সম্মানের স্থান পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা। এ দুই স্থানে অবস্থিত পবিত্র কাবাঘর ও রাসূল সা.-এর রওজা মুবারক। প্রিয়নবী সা. এ দুই স্থানের সুস্পষ্ট মর্যাদা ঘোষণা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেন—

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“নিশ্চয় আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই আল্লাহ এই শহরকে (মক্কা নগরীকে) হারাম বা সম্মানিত করেছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম ও সম্মানিত থাকবে।” বুখারি : ১৮৩৪; মুসলিম : ১৩৫৩

নবীর শহর মদিনার মর্যাদাও অনস্বীকার্য। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন—

أَتَشُدُّ الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

“কেবল তিনটি মসজিদের দিকে (সওয়াবের উদ্দেশ্য নিয়ে) সফর করা যাবে—আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি), মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা।” বুখারি : ১১৮৯, মুসলিম : ৩৪৫০

মসজিদুল হারামাইনে সালাত আদায় করা অন্য যেকোনো স্থানে সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَكَانٍ سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

“আমার এই মসজিদে নামাজ আদায় অন্য মসজিদের হাজার নামাজের চেয়েও উত্তম। তবে (মক্কার) মসজিদে হারাম ছাড়া।” বুখারি : ১১৯০, মুসলিম : ১৩৯৪

আর মসজিদে হারামের নামাজ অন্য মসজিদের ভুলনায় লক্ষগুণ উত্তম।
রাসূলুল্লাহ সা. অপর হাদিসে বলেছেন—

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ

“মসজিদে হারামে একটি নামাজ অন্য মসজিদের এক লাখ নামাজের
চেয়ে উত্তম।” মাযমাউয যাওয়ায়িদ : ৪/১১

অপর হাদিসে তাওয়াফকারীর প্রতিটি কদমে কদমে গুনাহ মাফ ও সওয়াব
লেখার কথা বলা হয়েছে। উমাইর (রাহি.) বলেন—

“ভিড় ঠেলে হলেও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হাজরে আসওয়াদ ও
রুকনে ইয়ামানির কাছে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। রাসূল সা.-
এর অন্য কোনো সাহাবিকে আমি এরূপ করতে দেখিনি। আমি
বললাম—‘হে আবু আবদুর রহমান! আপনি ভিড় ঠেলে হলেও এই
দুই রুকনে গিয়ে পৌছেন, কিন্তু আমি তো ভিড় ঠেলে রাসূল সা.-এর
অন্য কোনো সাহাবিকে সেখানে যেতে দেখিনি।’ আমার কথার
উত্তরে তিনি বলেন—‘আমি এরূপ কেন করব না? রাসূল সা.-কে
আমি বলতে শুনেছি, এ দুটি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের
কাফফারা হয়ে যায়।’” তালিকুল রাগিব : ২/১২০

উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, পবিত্র মক্কা ও মদিনা
দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদা ও সম্মানের স্থান। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের
উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের উত্তম সুযোগ সেখানে রয়েছে। আল্লামা
দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭৪ সালে প্রথমবার পবিত্র হজ পালনের
উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন। এরপর ১৯৭৬ সাল থেকে শ্রেফতারের
পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজের আত্মিক উন্নয়ন ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রায় প্রতি
বছর হজ পালন করেছেন। একই লক্ষ্যে প্রতি রমজান মাসে উমরা পালন
শেষে হারামের অভ্যন্তরে ইতিকাফ করেছেন। এজন্য তিনি কারাবন্দি জীবনেও
মক্কা-মদিনা যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন।

সেদিন আমি উনার দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন—

“একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন জালিমের এ বন্দিশালা
থেকে মুক্ত হতে পারব কি না? তাঁর রহমত ও সাহায্যের বদৌলতে
যদি মুক্তি লাভ করি, তাহলে পুনরায় কুরআনের ময়দানে ফিরে যাব

এবং জীবনের বাকি সময় মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করতে থাকব।”

অতঃপর তিনি আমার কাছে দুআ কামনা করেন, যেন আল্লাহ তায়ালা ওনার এ দুটি আশা পূরণ করেন। আমি বললাম—‘আপনার জন্য দেশে-বিদেশে অসংখ্য মানুষ দুআ করছেন। অনেকেই কাবাঘরের গিলাফ ধরে কান্নাকাটি করে আপনিসহ ইসলামী আন্দোলনের সকল মজলুম নেতৃবৃন্দের জন্যও প্রতিনিয়ত দুআ করে থাকেন।’ এ কথা শোনার পর তিনি ‘আমিন’ বলে চোখের পানি মুছতে থাকেন। ওই সময়ে জালিম সরকারের বন্দিশালা থেকে মুক্তি লাভ এবং ওনার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে না দিলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে মহান আল্লাহ তায়ালায় কাছে আরও উত্তম মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ لَيْسَتْ قَوْمِي يَغْلِبُونُ ﴿٢٦﴾ بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

“তাকে (শহীদকে) বলা হলো—‘জান্নাতে প্রবেশ করো।’ সে বলবে, ‘হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি জানতে পারত যে, আমার রব কীসের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।’” সূরা ইয়াসিন : ২৬-২৭

আল্লামা সাঈদীর সাথে আমার কারাজীবনের শেষদিন

পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ নং সেলের পশ্চিম কোণে একটি খালি জায়গা আছে, যেখানে ভিআইপি বন্দিদের সেবকরা (সাজাপ্রাপ্ত আসামি) বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষাবাদ করত। জেলের প্রথম দিন বিকালবেলা হাঁটার সময় আমি তাদেরকে টমেটোর চারা রোপণ করতে দেখেছি। তারা এ টমেটো বাগানের পরিচর্যা করে বন্দিজীবনের বেদনা ও মানসিক চাপ লাঘব করার চেষ্টা করত। একদিন বিকেলে আল্লামা সাঈদীর সাথে প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে তিনি অনেক গল্প করলেন। কথা বলতে বলতে এক চক্রর শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় চক্রর শুরু সময় হুজুরকে বললাম—‘আমি যেদিন জেলখানায় আসি, সেদিন সেবকদের এ টমেটোর চারাগুলো রোপণ করতে দেখেছি। আজ দেখছি টমেটোগুলো লাল রং ধারণ করেছে। মনে হয় পেকে গেছে।’

ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি মুচকি হেসে বলেই ফেললেন—‘মনে হয় আপনার চলে যাওয়ারও সময় হয়েছে।’

এই কথা বলার দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে গোট দিয়ে একজন লোক ফাইল হাতে নিয়ে প্রবেশ করল। সে আমাকে সালাম দিয়ে বলল—‘স্যার, আপনাকে দ্রুত রেডি হতে হবে। কারণ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।’

আমি বললাম—‘সন্ধ্যা হয়েছে তাতে কী অসুবিধা?’

সে বলল—‘আপনার জামিন হয়েছে।’

এ কথা শুনে আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম! কারণ, এর পূর্বে এ ধরনের এক লোকের মাধ্যমে আমাকে অফিসে ডেকে নিয়ে মিন্টু রোডের ডিবি অফিসে চারদিন রিমান্ডে রাখা হয়েছিল। রিমান্ডে ডিবি পুলিশ কী আচরণ করে, তা কারও অজানা নয়। এমন ঘটনা পুনরায় হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আমার মনের ভেতরে আশঙ্কা কাজ করছিল। লোকটি আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আবার বলল—‘স্যার, আসলেই আপনার জামিন হয়েছে।’

এ খবর শুনে উপস্থিত সকলে আনন্দিত হলেও আমি মনের ভেতর কোনো কিছু হারানোর বেদনা অনুভব করলাম। মুক্তির আনন্দের পাশাপাশি সুন্দর এ পরিবেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে বলে একধরনের বেদনাও হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমি কক্ষ এসে জামাকাপড় পরিবর্তন করছিলাম। সেবকরা আমার মালামাল ও ব্যাগ গোছাচ্ছিল। এ সময় আমাদের দুই রাহবার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আল্লামা সাঈদীসহ আরও কয়েকজন ভিআইপি বন্দি আমার কক্ষে প্রবেশ করেন। সেবকদের সাথে ওনারা নিঃসংকোচে আমাকে প্রস্তুত করে দিয়ে প্রথমে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, এরপর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব আমার কপালে চুমু খেয়ে আমার জন্য দুআ করে বিদায় জানান। আমিও আমার ওপর আল্লাহর দ্বীনি আন্দোলনের পক্ষ থেকে অর্পিত জিম্মাদারি যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি, সেজন্য ওনাদের কাছে দুআ চাইলাম।

একে একে সেখানকার সকল বন্দির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় নিয়ে জেলখানা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কারা অফিসে রওনা দিই। একটু পরে জেলগেটের কাছে অবস্থিত ডেপুটি জেলারের কক্ষে পৌঁছে দেখি, আব্দুর রহমান মুসা ভাই সেখানে বসা (বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের ভারপ্রাপ্ত আমীর)। উনিও আমার সাথে একই মামলায়

গ্রেফতার হয়েছিলেন। ২০১২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনিও একই দিন জামিনে মুক্তি লাভ করেন। তখন মাগরিবের আজান শুনে আমরা এ অফিসে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করলাম। অনেকক্ষণ বসে থেকে অপেক্ষার পর ডেপুটি জেলারকে জিজ্ঞেস করলাম—‘আমাদের জেলখানা থেকে মুক্ত হতে আর কত সময় লাগবে?’ জবাবে তিনি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ফরমালাটি শেষ হয়ে যাবে বলে জানানেন। এর মধ্যে এশার আজান হলে আমরা জামায়াতের সাথে সেখানে সালাত আদায় করলাম। এরপর জামিন লাভের পরও আমাদের ছাড়তে বিলম্ব কেন জানতে চাইলে ডেপুটি জেলার বললেন—‘স্যার, আপনার সঙ্গী (মূসা ভাই) চলে যেতে পারেন। ওনার অফিসিয়াল ফরমালাটি শেষ হয়েছে। আপনার একটু বাকি আছে।’

আমি মূসা ভাইকে বললাম—‘আমার মনে হয় দেরি হবে; আপনি চলে যান। আপনি অসুস্থ মানুষ, রাত হলে কষ্ট হবে।’

কিন্তু উনি আমাকে একা রেখে যেতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করলেন। এর মধ্যে সংবাদ পেলাম, কারা ফটকের সামনের চত্বরে ঢাকা মহানগরীর নেতৃবৃন্দসহ সংগঠনের অনেক ভাই আমাদের রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। রাত নয়টার পর ডেপুটি জেলার জানানেন—‘আপনি একজন মাননীয় সংসদ সদস্য, তাই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্লিয়ারেন্স ছাড়া আপনাকে না ছাড়ার নির্দেশনা আছে।’

আমি বললাম—‘আমাকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত জামিন দিয়েছে। সুতরাং আমাকে আটকে রাখার কোনো এখতিয়ার কোনো মন্ত্রী ও সরকারের নেই। আপনারা আইন অনুযায়ী কাজ করুন।’

তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন—‘স্যার, এটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। আমার কিছু করার নেই।’

আমি বললাম—‘এটিই কি স্বাধীন দেশে আইনের শাসন?’

আমার এ কথা শুনে কোনো প্রত্যুত্তর আসলে উনার কাছেও নেই। তাই নির্বাক হয়েই রইলেন তিনি। এরপর আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তা ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। এর মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, ফ্যাসিবাদী সরকার আমাকে পুনরায় গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের ঘটনা তখন প্রায় ঘটছিল। একটু পর ডেপুটি জেলার এসে বললেন—‘স্যার আপনাকে

ছাড়ার ব্যাপারে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্রিম্যারেস পাওয়া গেছে এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও কোনো আপত্তি করেননি। আশা করি আপনি মুক্তি পাবেন; কোনো সমস্যা হবে না।’

আমি বললাম—‘তাহলে দেরি কেন, কী সমস্যা?’

জবাবে তিনি বললেন—‘মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।’ ওই কর্মকর্তা আরও জানালেন—‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে বক্তৃৎবনে ব্যক্ত আছেন। একটু পরে আমরা জানতে পারব।’

আনুমানিক রাত ১০টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত এলে জেলখানার অফিসে যারা ছিলেন, তাদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়ে মূল কারাফটক দিয়ে বেরিয়ে আসি। বের হয়ে দেখি, সেখানে হাজার হাজার লোক। ঢাকা মহানগরী কর্মপরিসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম ভুঁইয়াসহ নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালেন। অতঃপর কয়েকজনকে সাথে নিয়ে গাড়িতে করে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথিমধ্যে একজন অফিসার জানতে চান—আমি কি বাসায় না দলীয় অফিসে যাব? অনেক রাত হওয়ায় সবাই পরামর্শ করে বাসায় যাওয়ার কথা তাকে জানিয়ে দিই। কারাজীবনের আড়াই মাস অতিবাহিত হওয়ার পর রাত প্রায় ১২টায় আমার রামপুরা বনশ্রী সংলগ্ন বাসায় গিয়ে পৌছি। বন্দিজীবনের অবসান হওয়ায় আমার স্ত্রী, সন্তানসহ, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী সকলের উদ্বিগ্নতা কেটে যায়।

পরদিন সকাল থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীগণ বাসায় দেখা করতে আসেন। সাংগঠনিক কার্যক্রম ও জরুরি বৈঠকসমূহে বাসাকেন্দ্রিক চলতে থাকে। কারণ, ওই সময় আমাদের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরী অফিসসহ সারা দেশের অফিসগুলো পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছিল। বাসায় দু-তিন দিন থাকার পর দেখি, আমার মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া, স্বাভাবিক চলাফেরা ও বাসায় অবস্থানের ওপর নজরদারির জন্য সরকার লোক নিযুক্ত করেছে। গোয়েন্দা সংস্থার যে লোকটি ইতঃপূর্বে আমার নজরদারির জন্য মহানগরী অফিসে নিযুক্ত ছিল, তাকে বাসার সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখে আমি বিষয়টি নিশ্চিত হলাম। তখন বাধ্য হয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে আমরা সপরিবারে সিদ্ধেশ্বরীতে চলে যাই। সেখানে এক মাস থাকার পর একই ঘটনা ঘটল। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোক পরিচয় দিয়ে একজন আমার ব্যক্তিগত

সহকারীর কাছে সেলফোনে আমার বাসার ঠিকানা জানতে চান। কারণ, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে সরকারের পক্ষ থেকে আমার খোঁজখবর রাখার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে বলে জানান। এরপর বারবার বিরক্ত করলে তার সাথে আমি নিজে কথা বলি। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সে একদিন আমার ব্যক্তিগত সহকারীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নতুন বাসায় চলে আসে। তখন বাসায় থাকা নিরাপদ মনে না হওয়ায় সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করি—যা এখনও অব্যাহত আছে। এভাবে বারো বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, এ জুলুমের শেষ কোথায়! আমাদের অসংখ্য নেতা-কর্মী ছোট কারাগারে বন্দি। আর যারা বাইরে আছে, তারা যেন বড়ো কারাগারে বন্দি হয়ে দিনাতিপাত করছি। ভাবতে কষ্ট হয়, একটি স্বাধীন দেশ হয়েও গোটা বাংলাদেশ যেন এক যুগের বেশি সময় ধরে গণকারাগারে পরিণত হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য জেল-জুলুম স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সেটি কারাগারের অভ্যন্তরে হোক বা কারাগারের বাইরে জুলুম-অত্যাচার হোক। এ যেন সেই হাদিসেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি, যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—

الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

“দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরদের জন্য জান্নাতের সমতুল্য।” মুসলিম : ২৯৫৬

হাদিসটির ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি.) বলেন—

“মৃত্যুর পর মুমিনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অফুরন্ত নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেই তুলনায় দুনিয়া তার কাছে কারাগারের মতো। অন্যদিকে মৃত্যুর পর কাফিরের জন্য আল্লাহর যে আজাবের সাবধানবাণী দেওয়া হয়েছে, সেই তুলনায় দুনিয়া তার কাছে জান্নাতের মতো। অর্থাৎ, পরকালের অফুরন্ত সুখ বা দুঃখের বিবেচনায় দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য কারাগার বা জান্নাত হবে।”

জামিউর রাসাইল : ২৬১/২

১৮. ইসলাম, দেশপ্রেম ও

জাতির স্বার্থরক্ষাই তাঁদের অপরাধ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষনেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ অপরাধের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে একটি মীমাংসিত ইস্যুকে পুনরায় সচল করে; তা হলো—১৯৭১ সালের তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।

২০০৮ সালে সেনাসমর্থিত অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনে বিজয় লাভ করে। প্রশ্নবিদ্ধ এ নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়ে গেছে বলে জানান। অতঃপর আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের কিছুদিন পর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০০ কিলোমিটার উজানে ভারত সরকার মণিপুরে বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত কর্তৃক এ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। এ অবশ্যম্ভাবী বিরূপ প্রভাবের ভয়াবহ চিত্র প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যুতে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও দায়িত্বশীল ইসলামী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের জনগণের পাশে দাঁড়ায় এবং ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোয় জনসভা করে এর প্রতিবাদ জানায়। এসব জনসভায় আল্লামা সাঈদীও টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধের দাবি জানানোর পাশাপাশি দেশবাসীকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ফলে এটি বাংলাদেশের বহুল আলোচিত ইস্যুতে পরিণত হয়। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে যখন দেশের জনগণ উদ্বেগ, তখন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে এ বাঁধের বৈধতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়। আমি তখন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। কমিটির এক সভায় সাবেক মন্ত্রী ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রাজ্জাক টিপাইমুখ বাঁধ পরিদর্শনের প্রস্তাব করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠার ভিত্তিতে তা সভায় পাস হয় এবং বাঁধ পরিদর্শনের জন্য আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়। এতে কমিটি আমার নামও অন্তর্ভুক্ত করে। কোনো বিশেষজ্ঞ ছাড়াই বাঁধ পরিদর্শন টিম গঠন করায় এবং এ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে জামায়াতের শক্তিশালী অবস্থান থাকায় আমি দেশের স্বার্থবিরোধী পরিদর্শন টিমের তালিকা থেকে আমার নাম লিখিতভাবে প্রত্যাহার করি। অতঃপর আমার স্থলে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল আজীমের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদিকে ঘটনা অবগত হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আমাকে ফোন করে জামায়াতে ইসলামীর এ অবস্থানকে সাধুবাদ জানান। এতে আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াতে ইসলামীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়।

অবশেষে সংসদীয় প্রতিনিধিদল টিপাইমুখ বাঁধ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ২৯ জুলাই, ২০০৯ তারিখে ভারত সফরে যায়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রকল্প এলাকার যোগাযোগব্যবস্থা দুর্গম পাহাড়ি পথ হওয়ার কারণে তারা হেলিকপ্টারযোগে টিপাইমুখ বাঁধ পরিদর্শনে যান। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে দুদিন চেষ্টার পরও তারা প্রকল্প এলাকায় নামতে পারেনি। প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে পরিদর্শন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। তারপরও বাংলাদেশের এ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ভারতের পক্ষাবলম্বন করে জাতীয় সংসদে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। বাংলাদেশের জনগণ টিপাইমুখ বাঁধসহ জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বেগ হলেও ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগ সরকার তাতে মোটেও উদ্বেগ নয়।

দেশের স্বার্থ রক্ষায় জামায়াতে ইসলামীর শক্তিশালী অবস্থান ও টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে জামায়াতের এ আন্দোলন দেশের জনগণের মাঝে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলে। ফলে দেশবাসীর কাছে জামায়াতে ইসলামীর সুনাম ও

মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জামায়াতের এই অবস্থান ভারত ও ভারতবর্ষে স্বার্থান্বেষী মহলকে ক্ষুব্ধ করে। অতঃপর তারা জামায়াতে ইসলামী ও এর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে আওয়ামী লীগ তাদের বিদেশি প্রভুকে খুশি করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়ন শুরু করে। একই উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালের ২৯ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব পাস করে।

অবশেষে আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ৩৯ বছর পর আইন সংশোধন করে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। তিন সদস্যের সেই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয় বিচারপতি মো. নিজামুল হককে। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুজন বিচারক ছিলেন বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবীর এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ কে এম জহির আহমেদ। পাশাপাশি আইনজীবী প্যানেল এবং তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ তথাকথিত যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার এবং তাদের কথিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তের উদ্যোগ নেয় ট্রাইব্যুনাল। সেইসাথে তাদের বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুরাতন হাইকোর্ট ভবনকে আদালত হিসেবে প্রস্তুত করা হয়।

আল্লামা সাঈদীর বিচার করার উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল-১ ওই বছরের ২ আগস্ট তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ওনাকে গ্রেফতার দেখায়। দীর্ঘ ৩১৩ দিন তদন্ত করে ২০১১ সালের ১১ জুলাই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ এবং ১৪ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল। অভিযোগের বিষয়ে শুনানি শেষে ৩ অক্টোবর আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মোট ২০টি অভিযোগ গঠন করে ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্য দিয়ে এ মামলার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সেই দিন ২০টি অভিযোগ গঠন করার পর তিনি দোষী না নির্দোষ—এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

“আমার বিরুদ্ধে আনীত ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার। আমার বিরুদ্ধে রচনা করা ৪ সহস্রাধিক পৃষ্ঠার

প্রতিটি পাতার, প্রতিটি লাইনের, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি বর্ণ মিথ্যা, মিথ্যা এবং মিথ্যা। ২০টি অভিযোগের সব কটিই বানোয়াট। এর সাক্ষীও মিথ্যা। আমি ১৯৭১ সালে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস কিছুই ছিলাম না, কমান্ডার হওয়া তো অনেক দূরের কথা। পাক হানাদার বাহিনীর সাথে আমার ১ মিনিটের জন্যও কখনও কোনো বৈঠক হয়নি।”

সেদিন আল্লামা সাঈদীর হাতে একখণ্ড কুরআন মাজিদ ছিল। প্রতিদিন কারাগার থেকে আদালতে আসার সময় তিনি এটি সাথে নিয়ে আসতেন। আদালতে কুরআন পড়ে তিনি সময় কাটাতেন। অভিযোগ শুনানিকালে সরকারের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তিনি আদালতের কাঠগড়ায় বসে কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন—

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٢١٦﴾

“তারা যে চক্রান্ত করেছিল তা ছিল সত্যিই ভয়ানক! কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর দৃষ্টির ভেতরেই ছিল। যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন ছিল যে, তাতে যেন পর্বতও টলে যাবে!” সূরা ইবরাহিম : ৪৬

কথিত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ২০১১ সালের ৭ ডিসেম্বর এ মামলায় আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। প্রায় সাড়ে চার মাসে তদন্ত কর্মকর্তাসহ ২৮ সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। আইনে সুযোগ থাকার পরও আল্লামা সাঈদীর পক্ষে মাত্র ১৭ সাক্ষীর বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দেয় ট্রাইবুনাল। এ মামলার ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ, জেরা এবং যুক্তিতর্ক (আর্গুমেন্ট) উপস্থাপন শেষ হয়। ট্রাইবুনালে যুক্তিতর্ক শেষ হলে আল্লামা সাঈদী আদালতের উদ্দেশ্যে বলেন—

“মাননীয় আদালত, আজকের এ বিচার প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে দুটি পর্বে শেষ হবে। তার একটি এ জাগতিক আদালতে আর অপরটি আখিরাতের আদালতে। আজ আমি এ আদালতের অসহায় এক নির্দোষ আসামি, আর আপনারা বিচারক। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণে, ক্ষমতার জোরে আমার প্রতি যদি জুলুম করা হয়, তাহলে আজকের দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ, যারা আদর্শিক কারণে

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমার প্রতি জুলুমের প্রয়াস পাচ্ছেন, তারা দ্বিতীয় পর্বের বিচারের দিন, কিয়ামতের দিন নিঃসন্দেহে আসামি হবেন। ইনশাআল্লাহ, সেদিন আমি হব বাদী আর সর্বশক্তিমান, রাজাধিরাজ, সম্রাটের সম্রাট, আকাশ ও জমিনের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি, সকল বিচারের মহাবিচারপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন—তিনিই হবেন সেদিনের আমার দায়ের করা মামলার বিচার প্রক্রিয়ার বিচারক। আপনাদের তিনজনের প্রতি আমি আশা রেখে বলছি, আল্লাহ আপনাদের ন্যায়বিচারের তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে, সুবিচার বর্জনে তোমরা প্ররোচিত হবে। তোমরা সুবিচার করো এবং সুবিচারই তাকওয়ার নিকটবর্তী। তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।’ সূরা মায়িদা : ৮

মহান আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَاطِلَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٢﴾

“সেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব; নিশ্চয় আমি হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী।” সূরা দুখান : ১৬

স্কাইপি কেলেঙ্কারি

এরপর ২০১২ সালে মামলা চলাকালে একটি জঘন্য ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। সেটি হলো ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক এবং বেলজিয়াম প্রবাসী আহমেদ জিয়াউদ্দিন নামে এক ব্যক্তির মধ্যে স্কাইপ কথোপকথন ও

ইমেইল যোগাযোগের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাালের কাজে হস্তক্ষেপ করা। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা এ কথোপকথনগুলো ডিসেম্বর মাসে সম্পূর্ণ লিখিত লিপি একটি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে—যা জাতির কাছে ‘স্কাইপি কেলেঙ্কারি’ নামে পরিচিত। ১৩ ডিসেম্বর একটি আদালতের আদেশে বাংলাদেশি সংবাদপত্রগুলোকে এ কথোপকথনের সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, আর সে সময় আমার দেশ পত্রিকাকে আদালত নিষিদ্ধ করে, ফলে তারা আর এটি নিয়ে পরে কিছু প্রকাশ করতে পারেনি।

দি ইকোনমিস্ট (লন্ডন)-এর মতে, রেকর্ডিং ও ইমেইলগুলো নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচারের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে এবং হস্তক্ষেপ করেছে। বিচারপতি নিজামুল হকের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ, জিয়াউদ্দিন তাকে ট্রাইব্যুনালের জন্য দলিল প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিলেন এবং বিচারপতি নিজামুল হকের হয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করেছিলেন তিনি। জিয়াউদ্দিন প্রসিকিউটর জেয়াদ আল-মালামসহ অন্য প্রসিকিউটরদেরও পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর প্রসিকিউটররা কীভাবে তাদের মামলা চালাবেন, সে সম্পর্কেও তিনি বিচারপতি নিজামুল হককে অবহিত করেছিলেন। এর ফলে বিচারক, উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপক্ষের মধ্যে অনৈতিক সংযোগ তৈরি হয়েছিল।

২০১২ সালের ১১ ডিসেম্বর বিচারপতি নিজামুল হক ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-১)-এর চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। জামায়াতে ইসলামী এ ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবি করা সত্ত্বেও তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, ‘বিচারপতি নিজামুল হকের পদত্যাগ বিচার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে না।’ ১৩ ডিসেম্বর তদানীন্তন দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনালের প্রধান (আইসিটি-২) এটিএম ফজলে কবিরকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়। বিচারপতি এটিএম ফজলে কবিরের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ ওই বছরের ২৩ ডিসেম্বর আল্লামা সাঈদীর পক্ষে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক মামলার কার্যক্রম নতুন করে শুরু করার আবেদন জানান। এর পরদিন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এ আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারকাজ নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন—‘ট্রাইব্যুনাল-১-এর মামলাগুলোর কাজ যে পর্যন্ত হয়েছে, তারপর থেকেই

বিচারকাজ শুরু হবে।’ তবে প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক আসিফ নজরুল টেলিভিশন টকশোতে বলেছিলেন—‘সাঈদীর মামলা নতুন করে শুরু করতে হবে।’ এর পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল, ট্রাইব্যুনাল-১-এ বর্তমানে যে তিনজন বিচারক রয়েছেন, তাদের কেউই সাঈদীর মামলার শুরু থেকে ছিলেন না অর্থাৎ, তারা এ মামলা পুরোটা শোনেননি। তাই তারা যদি আল্লামা সাঈদীর মামলার রায় দেন, তাহলে সেটা বিতর্কিত হবে। একই কথা বলেছে, নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’। ওই বছরের ১৩ ডিসেম্বর এ নিয়ে তারা একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়েছে, সাঈদীর মামলা পুনরায় শুরু করতে হবে। সংস্থাটির এশিয়া পরিচালক ব্রাদ অ্যাডামস বলেন—

“রায় ঘোষণা করাটা হবে ‘দায়িত্বহীন’ ও ‘অপেশাদারসুলভ’ আচরণ। কেননা, বর্তমান বিচারকদের কেউই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনেননি এবং তারা মূল সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণে সমর্থ নন; বিশেষ করে যে মামলায় রয়েছে ৪০ বছরের পুরোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জটিল আইনি বিষয়।”

অ্যাডামস বলেন—

“বিচারপতি নাসিম পদত্যাগ করার আগে ট্রাইব্যুনাল-১-এ একমাত্র তিনিই ছিলেন, যিনি সাঈদীর মামলার গুনানি পুরোটা শুনেছিলেন। ফলে তিনি চলে যাওয়ায় নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে নতুন করে বিচারকাজ শুরু করাই একমাত্র উপায়।”

আইন বিশেষজ্ঞদের সুস্পষ্ট অভিমত থাকা সত্ত্বেও আসামিপক্ষের উপস্থাপিত আবেদন ট্রাইব্যুনাল খারিজ করে দেয় এবং পুরো মামলা না শুনে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর পাঁচ কার্যদিবসে রাষ্ট্রপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী। অন্যদিকে সাত কার্যদিবসে আল্লামা সাঈদীর পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ও অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলাম। এরপর ২০১৩ সালের ১৩ জানুয়ারি মামলাটির বিচারিক প্রক্রিয়া দ্বিতীয়বারের মতো শেষ হয়।

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে তথাকথিত মানবতাবিরোধী বিচারের নানা বিতর্ক ও প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও অবশেষে ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুরে

আদালতে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায়ে আটটি অভিযোগে ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং দুটি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। রায় শেষ হওয়ার পরপরই উঠে দাঁড়িয়ে আল্লামা সাঈদী আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

“আপনারা নিজেদের শপথের ওপর দায়বদ্ধ থেকে বিচার করতে পারেননি। আপনারা শাহবাগের নাস্তিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ রায় দিয়েছেন।”

রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এ রায়ে তারা সন্তুষ্ট। তিনি বলেন—‘আমরা মনে করি, আমরা একটি ন্যায়বিচার পেয়েছি। যে ধরনের অভিযোগ তাতে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো শাস্তি দিলে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারতাম না।’

এদিকে আদালতের এ রায়কে অপ্রত্যাশিত হিসেবে উল্লেখ করে আল্লামা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন—নিয়মানুযায়ী তারা এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। তিনি দাবি করেন—‘যেসব অভিযোগে আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলো অভিযোগই তাঁর আইনজীবীরা মিথ্যা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ রায়টি অবিশ্বাস্য, অপ্রত্যাশিত এবং এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। প্রসিকিউশনের সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা মিথ্যা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি। তারপরও কেমন করে মাননীয় আদালত এ রায় দিলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়।’

১৯. বিচারের নামে অবিচার

আল্লামা সাঈদীর এ রায়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় রায় এবং জামায়াতে ইসলামীর কোনো শীর্ষনেতার মামলায় দেওয়া দ্বিতীয় রায়। ইতঃপূর্বে জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল প্রথিতযশা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ জনাব আবদুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ট্রাইব্যুনাল। এর পরপরই কথিত যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে ইসলামবিদ্বেষী অপশক্তি ঢাকার শাহবাগে আন্দোলন শুরু করে। সেই আন্দোলনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সরকার। ফলে আইন সংশোধন করে আপিলের মাধ্যমে জামায়াতের শীর্ষনেতা আবদুল কাদের মোল্লাকে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়। আদালতকে প্রভাবিত করে রায় পরিবর্তনের ঘটনা বাংলাদেশে আইনের শাসনের জন্য একটি কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

আল্লামা সাঈদীর ফাঁসির আদেশ ট্রাইব্যুনাল-১-এর তৃতীয় রায় হলেও শাহবাগী ফ্যাসিবাদী অপশক্তির চাপের মুখে আইন সংশোধনের পর এটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়। এ রায়ে যে আটটি অভিযোগে ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে পিরোজপুরে ইব্রাহিম কুটি হত্যা এবং বিশাবালি হত্যা। এ দুটি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। উক্ত দুজনের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য এবং আল্লামা সাঈদীর আইনজীবীদের অভিমত অনুযায়ী, ওনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল মিথ্যা, বানোয়াট ও সাজানো নাটক—যা রায় পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর মামলার বিচারের জন্য প্রকৃত দাবিদার ছিল ইব্রাহিম কুটির স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, শ্যালক, শ্যালিকা, শাশুড়ি। কিন্তু তারা কেউ ট্রাইব্যুনালে নালিশ করেননি; এমনকি সাক্ষী হিসেবেও তারা আসেননি।

ইব্রাহিম কুটির স্ত্রী মমতাজ বেগম ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই তার স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে মামলা করেছিলেন। তাতে তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, তার স্বামীকে ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর তার পিতার নলবুনিয়াস্থ বাড়িতে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী ৬ নং সাক্ষী মানিক পশারী ও ৭ নং সাক্ষী মফিজ উদ্দীনের সাক্ষ্য অনুসারে ইব্রাহিম কুটিকে ১৯৭১ সালের ৮ মে চিতলিয়া গ্রামে মানিক পশারীর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পারেরহাট বিজের ওপর গুলি করে হত্যা করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো—কার কথা সত্য? স্ত্রীর কথা, না আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ও বর্তমান সরকারের বিশেষ সুবিধাভোগী মানিক পশারী আর মফিজ উদ্দীনের কথা?

মমতাজ বেগমের দায়েরকৃত ওই মামলার বিবরণে বলা হয়—১ অক্টোবর শুক্রবার ভোররাতে তার পিতার বাড়িতে (ইব্রাহিমের শ্বশুরবাড়ি) থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে মমতাজ বেগম নিজেও আহত হন এবং তার মা সেতারা বেগম ও ভাই সিরাজকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মমতাজ বেগম ও সেতারা বেগম, ইব্রাহিম কুটির শ্যালক মোস্তফা হাওলাদার এবং শ্যালিকা রানী বেগম জীবিত থাকলেও প্রসিকিউশন দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এদের কাউকে সাক্ষী করেনি। এমনকি ইব্রাহিমের ছেলে মাহবুব এবং মেয়ে রোকসানা বেগম জীবিত আছে, তাদেরও সাক্ষী করা হয়নি। এ যেন মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। উল্লেখ্য, ইব্রাহিম কুটির স্ত্রী মমতাজ বেগমের দায়েরকৃত মামলায় যে ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছিল, তাতে মাওলানা সাঈদী তো নয়ই, ওই সময়ের কথিত রাজাকার দেলোয়ার সিকদারের নামও ছিল না। তাই সত্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ওই মামলার নথি আনা হয়নি এবং ইব্রাহিম কুটির কোনো নিকটাত্মীয়কে সাক্ষী করা হয়নি।

ট্রাইব্যুনালের রায়ে দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ছিল বিশাবালি হত্যা। বিশাবালির ভাই সুখরঞ্জন বালি মামলা চলাকালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। ২০১২ সালে ৩ নভেম্বর দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুখরঞ্জন বালি স্থানীয় ভাষায় বলেন—

“মামলার বাদী মাহবুব মোরে চাপ দেয় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। সাঈদী সাব মোর ভাই বিশাবালিরে খুন করে নাই। সাঈদী সাব মোর ভাই বিশাবালিরে খুন করছে—মুই মোর ভাইর মরণ লইয়া এই রহমের মিথ্যা কতা কইতে পারমু না।”

সুখরঞ্জন বালি বলেন—‘বহর দেড়েক আগে পারেরহাট হাইস্কুলে তদন্ত সংস্থার লোকজনের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মাওলানা সাঈদীর মামলার বাদী স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হাওলাদার আমাকে সেখানে নিয়ে যান। মাহবুব এবং তার সঙ্গী মানিক তদন্ত সংস্থার লোকজনের সামনে আমার দুপাশে বসে। আমার ভাই বিশাবালি হত্যার জন্য দায়ী করে মাওলানা সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেওয়ার কথা বলে। আমি সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কথা না বলায় তারা আমাকে মারধর করে। আমি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলি—আমি যা মুখে বলব, তা-ই যেন লেখা হয়। এ সময় তদন্ত সংস্থার লোকজন মাহবুবকে বলতে থাকেন—কাকে নিয়ে এসেছ? সে তো ক্ষতি করে ফেলবে। একপর্যায়ে আমাকে সেখান থেকে চলে আসতে বলা হয়। তিনি বলেন—সেখানে কোনো জবানবন্দি আমি দিইনি, কাগজে স্বাক্ষরও দিইনি। এরপর মাহবুব আমাকে বলে, সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে সে আমাকে দেড় লাখ টাকা দেবে। এতে আমি রাজি না হওয়ায় সে আমাকে পায়ের রগ কেটে ফেলার হুমকি দেয়। এতে আমি আমার আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে যাই।’

সুখরঞ্জন বালি জানান—এ ঘটনার পর একদিন তার বাড়িতে পুলিশ নিয়ে যায় মাহবুবুল আলম। সেদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তিনি বলেন, তারা আমার মেয়ে ও স্ত্রীকে বলে সুখরঞ্জন নিখোঁজ মর্মে একটি মামলা করার জন্য। এ প্রস্তাবে স্ত্রী ও মেয়ে রাজি না হলে তারা বিভিন্নভাবে চাপ দেয়। একপর্যায়ে সাদা কাগজে আমার মেয়ের একটি স্বাক্ষর নিয়ে যায় তারা। এ স্বাক্ষর দিয়ে তারা থানায় জিডি করেছে বলে আমি শুনেছি। তিনি আরও বলেন—

“আমি ট্রাইব্যুনালে সত্য কথা বলতে চাই। মিথ্যার ওপর সাঈদী সাহেবের মতো একজন মানুষের বিচার হতে পারে না। ট্রাইব্যুনালের সত্য বিষয়টি জানানো দরকার বলেই ঢাকায় এসেছি।”

আল্লামা সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুখরঞ্জন বালি নিজ থেকে সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ২০১২ সালের ৫ নভেম্বর এ আবেদন শুনানির জন্য ধার্য ছিল। ওইদিন তিনি হাজির হলে ট্রাইব্যুনালের গেট থেকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এরপর তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না।

সরকারি নীলনকশা অনুযায়ী সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সুখরঞ্জন বালিকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। কিন্তু সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না—সত্যের জয় হয়ই। সুখরঞ্জনের অন্তর থেকে বের হওয়া সত্যকে ঢেকে রাখতে পারেনি সরকার। ‘অবশেষে ভারতের একটি কারাগারে বালির সন্ধান পাওয়া গেছে’ মর্মে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি নিউ এজ খবর প্রকাশ করে। এরপর বিবিসি, আল-জাজিরা, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ হতে থাকে। আসামিপক্ষ থেকে ট্রাইব্যুনালে এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হলেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে সুখরঞ্জন বালির সন্ধান চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের হলে আদালত তা খারিজ করে দেয়। ইতোমধ্যে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাকে অপহরণ করে ভারত সীমান্তে ঠেলে দেয়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী (বিএসএফ) তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেই সময় আটকের পর থেকে সুখরঞ্জন বালি কলকাতার দমদম সংশোধন কেন্দ্রে ১০৫ দিন বন্দি জীবনযাপন করেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুখরঞ্জন বালি হলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তার রাজনৈতিক আদর্শ এবং আল্লামা সাঈদীর রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ভিন্ন ধর্ম ও বিপরীত মতাদর্শের একজন লোককে ঘায়েল করার বিরাট সুযোগ পেয়েও সুখরঞ্জন বালি বিবেকের দায় থেকে সত্য কথা বলেছেন। সুখরঞ্জন বালি তার এ মহৎ কর্মের জন্য ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে তিনি একজন সৎ মানুষের প্রতিচ্ছবি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আল্লামা সাঈদীর ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ওনার আইনজীবী টিমের প্রধান ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—

“বিশাবালি হত্যার ঘটনায় তার ভাই সুখরঞ্জন বালি ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীর পক্ষে সাক্ষী দিতে এসেছিলেন। দেশবাসীসহ সকলের জানা আছে, সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে তুলে নিয়ে যায় ট্রাইব্যুনালের গেট থেকে। এরপর থেকে দীর্ঘদিন তার আর হৃদিস নেই।

আরেকটি হলো ইব্রাহিম কুটি হত্যাকাণ্ড। ইব্রাহিম কুটির স্ত্রী ১৯৭২ সালে থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন। সেখানে মাওলানা

সাইদীর নাম নেই। আমরা আদালতে এই এজাহারের কপি দাখিল করেছি। এখন কীভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো সেটাই প্রশ্ন। এ দুটি ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় উই আর রিয়েলি সারপ্রাইজড।”

রাজনৈতিক বিবেচনায় রায় দেওয়া হয়েছে কি না—সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন—

“মাওলানা সাঈদীর মামলাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা ট্রাইব্যুনালে এ অভিযোগের পক্ষে অনেক প্রমাণ উত্থাপন করেছি।...”

শাহবাগের ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের ফলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বা এর প্রভাব পড়েছে কি না—এ প্রশ্নে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন—

“এটা আইনের কোনো বিষয় নয়। বিচারকরা সংবিধান, আইন এবং তার বিবেক অনুসারে বিচার কাজ করেন। বাইরে থেকে কে কী বলল, সেটা বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।”

২০১৩ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার দুপুরে ধানমন্ডির বাসভবনে রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এর পরদিন ২৯ ফেব্রুয়ারি লিখিত প্রতিক্রিয়ায় ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন—

“মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় মুফাসসিরে কুরআন। গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, তাঁর বিরুদ্ধে এ রায় সম্পূর্ণভাবে ন্যায্যভ্রষ্ট। এ রায়ের মাধ্যমে মাওলানা সাঈদীর ওপরে চরম অবিচার করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের উচিত ছিল তাঁকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করে খালাস দেওয়া।

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত ২০টি অভিযোগের মধ্যে ১৬টি অভিযোগ ছিল মানবতাবিরোধী অপরাধের। ৪টি ছিল গণহত্যার। একটি অভিযোগও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা প্রমাণ করতে পারেনি। প্রসিকিউশন ২৮ সাক্ষীর বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। প্রত্যেকটি সাক্ষীর বক্তব্য অসত্য প্রমাণ করতে আসামিপক্ষ সক্ষম হয়েছে। এর বাইরে ১৬ সাক্ষীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা

আদালতে আনা সম্ভব নয় বলে বক্তব্য দিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তাদের কথিত বক্তব্যকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের জেরা করা সম্ভব হয়নি। কথিত এই খুঁজে না পাওয়া সাক্ষীদের মধ্যে একজন উম্মারানী মালাকার টেলিভিশনে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তার স্বামী হরলাল মালাকারের হত্যার সাথে মাওলানা সাঈদী কোনোভাবেই জড়িত নন। অপর দুজন আদালতে এসে প্রসিকিউশন যে তাদের নামে মিথ্যা বক্তব্য দিচ্ছে, তা বলতে চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে বহুল আলোচিত ভাগীরথির ছেলে গণেশ সাহা আদালতে দাঁড়িয়ে তার মায়ের ব্যাপারে সাঈদী সাহেবকে জড়িয়ে প্রসিকিউশন যে মিথ্যাচার করেছে, তা তুলে ধরেছেন। অপরজন সুখরঞ্জন বালি তার ভাই বিশাবালি হত্যার ব্যাপারে সরকার পক্ষের মিথ্যাচার ফাঁস করে দেওয়ার জন্য আদালতের দরজা পর্যন্ত আসতে পারলেও পুলিশ সেখান থেকে তাকে ৫ নভেম্বর অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।...

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো যে কত বড়ো মিথ্যাচার, সুখরঞ্জন বালির প্রতি সরকারের আচরণ থেকে তা প্রমাণিত। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো—যে সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে প্রচার করা হচ্ছিল, তাদের কাউকে কাউকে সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত সরকারের হেফাজতে সেইফ হাউসে আটকে রাখা হয়েছিল। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ওই সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি না হলে তাদের অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর প্রমাণ হিসেবে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার দলিলপত্র আমরা আদালতে উপস্থাপন করেছিলাম। বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন ট্রাইব্যুনাল এ অকাট্য প্রমাণ গ্রহণ করেনি।

পরবর্তী সময়ে বিচারপতি নিজামুল হকের স্কাইপি কলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর বাংলাদেশের জনগণসহ বিশ্ব দেখেছে কীভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অসত্য সাক্ষ্য দিয়ে বিচারক এবং প্রসিকিউশনের যোগসাজশে এমনকি বিদেশ থেকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, আদেশ এবং রায় তৈরি করে মাওলানা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। বিচারপতি নিজামুল হকের স্কাইপি সংলাপ এবং ইমেইল থেকে প্রাপ্ত এসব অকাট্য দলিল ওই ট্রাইব্যুনালের সামনে আসার পরও এ ট্রাইব্যুনাল সেগুলোকে আমলে নিয়ে মামলা পুনর্বিচারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে—যা বিচার বিভাগের ইতিহাসে এক বড়ো কলঙ্কজনক ঘটনা। এভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মিথ্যাচার ও অবিচারের শিকার হয়েছেন।

আইনে সুযোগ থাকার পরও প্রসিকিউশনের ২৮ জন সাক্ষীর বিপরীতে মাওলানা সাঈদীর পক্ষে মাত্র ১৭ জন সাক্ষীর বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ১৭ জন সাক্ষীকে বক্তব্য প্রদানে বাধা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রসিকিউশনে সাক্ষীদের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জেরা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এত সব প্রতিবন্ধকতার পরও প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে মাওলানা সাঈদীকে সাজা প্রদানের মতো ন্যূনতম উপাদান না থাকার পরও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ রায়ে আমরা সংশ্লিষ্ট। আমরা এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করব। আশা করি, আপিলে সুবিচার পাব।”^২

ট্রাইব্যুনাল আল্লামা সাঈদীর রায়ে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধের (গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটতরাজ ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরে বাধ্য করা) অভিযোগে ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করে। রাজাকার বাহিনীর হয়ে পিরোজপুর জেলায় মাওলানা সাঈদী এসব অপরাধ সংঘটিত করেছিলেন বলে আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়। আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগগুলো পুরোপুরি মিথ্যা ও সাজানো বলে দাবি করেন তাঁর অপর আইনজীবী অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলাম। তিনি মামলার দ্বিতীয় দফার আর্গুমেন্টের জবাবে যুক্তি উপস্থাপনকালে আদালতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

“পুরো মামলাটিই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। আর এর মূল ষড়যন্ত্রকারী হলেন তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন। তিনি ২০১০ সালের ৮ জুলাই সরকার কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ নিয়োগ পাওয়ার ৩ মাস আগেই তিনি চিফ প্রসিকিউটর বরাবর মাওলানা সাঈদীকে গ্রেফতারের আবেদন জানান এবং একই মাসে ২ নং সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। এটা সাক্ষী নিজেই আদালতে বলে গেছেন। তা ছাড়া এ তদন্ত কর্মকর্তা পিরোজপুর কোর্টে একটি মামলার সূত্র ধরে তদন্ত করতে গিয়ে ওই মামলার ১১ আসামির মধ্যে ৭ নম্বরে থাকা মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে শুধু তদন্ত করেছেন। বাকি আসামীদের বিষয়ে তদন্ত করেননি। এতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি ১৯৭১ সালের পিরোজপুর বা পারেরহাট এলাকায় সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত করেননি। বরং তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক কারণে একটি নীলনকশার অংশ হিসেবে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে তদন্তের নামে বানোয়াট কাহিনি রচনা করেছেন।”

অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন—

“মামলার সাথে সম্পর্কিত না হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত কর্মকর্তা কতিপয় বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এসবের উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববরণ্য এ মুফাসসিরে কুরআনকে জনসম্মুখে হয়-প্রতিপন্ন করা। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মাওলানা সাঈদী শর্শিনা মাদরাসা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। অথচ এর পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ বা শর্শিনা মাদরাসার কোনো সাক্ষী হাজির করেননি। মামলার ১ নং সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারকে দিয়ে তিনি এটি বলিয়েছেন, কিন্তু তাকে জেরা করলে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়—তার বাড়ি থেকে ২৫/৩০ কিলোমিটার দূরে শর্শিনা মাদরাসায় তিনি কখনোই যাননি। মাওলানা সাঈদী যখন ওই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন, তখনকার কোনো শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা উনার কোনো সহপাঠী ও ছাত্র কারও সাথেই তিনি কথা বলেননি। তাহলে তিনি জানলেন কী করে যে মাওলানা সাঈদীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল?

আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো যে, ‘আল্লামা’ বা ‘মাওলানা’ শব্দ লেখার কোনো যোগ্যতা সাঈদী সাহেবের নেই বলে উল্লেখ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা। ‘আল্লামা’ লিখতে হলে নাকি একাধিক ডক্টরেট ডিগ্রি থাকতে হবে। আল্লামা ইকবাল মহাকবি। তাঁর কয়টি পিএইচডি ছিল? অথচ আল্লামা ইকবাল কখনও মাদরাসায় পড়েননি। এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানীর কোনো মাদরাসার সার্টিফিকেট নেই। শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকেরও কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি নেই। এসব মহান ব্যক্তি কীসের ভিত্তিতে এসব অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। আমি এজন্যই তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেছি ‘মুফতি’ হেলাল উদ্দিন। কারণ, তিনি নিজেই এসব ফতোয়া দিয়েছেন।”

মাওলানা সাঈদীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বর্তমান সংসদ সদস্য এ কে এম আব্দুল আওয়াল ও রাষ্ট্রপক্ষের ১২ নম্বর সাক্ষী জবানবন্দি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন—

“তিনি সকালে বললেন, মে মাসের শেষ দিকে পিরোজপুরে পাক আর্মি আসার পর শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ওইদিন বিরতির পর প্রসিকিউশনের শেখানো মতে তিনি একটি দরখাস্ত দিয়ে বললেন, তিনি ‘এপ্রিলের’ পরিবর্তে ভুলক্রমে ‘মে’ বলেছেন। তার এ বক্তব্য প্রথমে যা বলেছিলেন, তা সত্য হলে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ১ থেকে ১০ নং চার্জের

একটিও থাকে না। পরে তিনি দরখাস্ত দিয়ে যা বললেন, তাতেও মামলা থাকে না। প্রসিকিউশন ২২ মে ১৯৭১-এর দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পেপার কাটিং দাখিল করেছেন। ওই খবরে দেখা যায় খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের নেতৃত্বে মে মাসের ১৭ তারিখে পিরোজপুরে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজাকার বাহিনী তারও পরে গঠিত হয়। আর সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ৭ মে পারেরহাটে তিনি পাক আর্মিদের স্বাগত জানিয়েছেন। তার মানে তিনি পাক আর্মি এলাকায় আসার আগেই তাদের স্বাগত জানিয়েছেন, শান্তি কমিটি গঠন করেছেন, রাজাকার বাহিনী গঠন করেছেন এবং হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাদের দেওয়া ডকুমেন্ট অনুসারেই মাওলানা সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। তারা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মতো একটি কাহিনি রচনা করেছেন।”

অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলাম উল্লেখ করেন—

“তাদের ডকুমেন্টেই আছে যে, ১৭ মে মাওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে খুলনায় প্রথম রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। তাহলে এটাই সত্য যে, ১৭ মে’র আগে রাজাকার নামক কোনো বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। রাজাকার অর্ডিন্যান্স অনুমোদন হয় ১৯৭১ সালের ২৫ জুন। আর তা কার্যকর হয়েছে ২ আগস্ট। আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করে রাজাকার অর্ডিন্যান্স কার্যকর করে ৭ সেপ্টেম্বর এ বাহিনীকে অস্ত্রিলারি ফোর্স হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি এপ্রিলের শেষ দিক থেকেই রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে অপরাধ করেছেন। প্রসিকিউশন এটাও বলেছে, ৭ মে’র এক মাস আগে পারেরহাটে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। অথচ তাদেরই ডকুমেন্টে আছে যে, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল ৯ মে তারিখে। তারা একদিকে বলছে, পারেরহাটে পাক আর্মি আসে ৭ মে। আবার বলছে, ৪ মে তারিখে ১৩টি গ্রামে হত্যা, গুলি, লুট ও অগ্নিসংযোগ করেছে আর্মি। আর সাঈদী সাহেব নাকি এগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। যেসব গ্রামের নাম বলা হয়েছে, ওইসব গ্রামের কাউকে সাক্ষী করা হয়নি। আবার পারেরহাটের সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছেন যে, ৭ মে’র এক সপ্তাহ আগে থেকেই তারা সাঈদী সাহেবকে পারেরহাটে দেখেছেন। তাহলে ৪ মে ওই ১১ গ্রাম, যার আয়তন অন্তত ৫০ বর্গকিলোমিটার—সেখানে গেলেন কীভাবে। তাদের কোন তথ্য সঠিক?

প্রসিকিউশনের ডকুমেন্টে মধ্য মাছিমপুর বাসস্ট্যান্ডের পেছনে বধ্যভূমির ছবি দেখানো হয়েছে। আর সেটা হলো সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের বাড়ির পেছনে। এতে কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর অভিযোগ করা হয়। মেজর জিয়াউদ্দিনকে সাক্ষী হিসেবে নাম দিয়েও সত্য বেরিয়ে পড়ার ভয়ে তাকে হাজির করেননি। আর সরকারি ডকুমেন্ট বলছে, পিরোজপুরে কোনো বধ্যভূমি নেই।

তদন্ত কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের এসব অসংগতিপূর্ণ ও মিথ্যা তথ্য এবং সরকারি ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে জনসম্মুখে হেয় করা এবং সাজানো মামলার মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর সত্যিকারের বিষয় হলো—১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী কোনো অপরাধের সাথে আল্লামা সাঈদী জড়িত ছিলেন না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই ওই সময়ের দেলোয়ার সিকদার (যাকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করেছিল) নামের রাজাকারের অপরাধের দায়ভার একজন নিরপরাধ আলেমে দ্বীন ও বিশ্বখ্যাত মুফাসসিরে কুরআনের ওপর চাপানো হয়। সেদিন আদালতের উদ্দেশ্যে আল্লামা সাঈদী বলেছিলেন, ‘মাননীয় আদালত! যার হাতের মুঠোয় আমাদের সকলের জীবন, সেই মহাশক্তিদর আল্লাহ তায়ালার নামে আপনাদের এই আদালতে বসে শপথ করছি, তাঁর পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে বলছি, আমার নামে আপনাদের এ আদালতে যতগুলো অভিযোগ আনা হয়েছে, তার হাজার কোটি মাইলের মধ্যে আমার অবস্থান ছিল না। উত্থাপিত অভিযোগের একটি বর্ণনাও সত্য নয়।...’

তা ছাড়া ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যারা ওই সেক্টরে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণও আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এসব মিথ্যা ও সাজানো অপবাদ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২০১০ সালে ১৩ মার্চ এটিএন বাংলা (টেলিভিশন) আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলে ওই সময়ে তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এখানে তাদের কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো—

মুক্তিযুদ্ধের পিরোজপুর জেলার সাবেক কমান্ডার গৌতম রায় চৌধুরী বলেছেন—‘১৯৭১ সালে মাওলানা সাঈদী রাজাকার ছিলেন না। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোনো কুকর্ম করে থাকলে আমরা তখনই জানতাম।’

পিরোজপুরের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী নুরুজ্জামান বাবুল বলেছেন—‘১৯৭১ সালে আমি সুন্দরবনে মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি। আমরাই পিরোজপুরকে শত্রুমুক্ত করেছি। ৭১ সালে পারেরহাট-জিয়ানগরের সব রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের ধরে নিয়ে সুন্দরবনে হত্যা করা হয়েছে। মাওলানা সাঈদী যদি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী হতেন, তাহলে জীবিত থাকার কথা নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমারও দাবি। কিন্তু কোনো নিরীহ, নিরপরাধ আলেমকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে এটিএন বাংলা যে সংবাদ পরিবেশন করেছে, তার নিন্দা জানাই।’

পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক কমিশনার আবদুর রাজ্জাক মুনান বলেন—‘মাওলানা সাঈদী ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোনো কাজ করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এটিএন বাংলার নির্লজ্জ মিথ্যাচার জাতি মেনে নেবে না।’

মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফ বালি বলেন—‘১৯৯৭ সালে বাজেট বক্তৃতায় মাওলানা সাঈদী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সামনে জাতীয় সংসদে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে এমন কোনো বাবার সন্তান নেই যে, আমাকে রাজাকার বলবে। আমাকে যারা রাজাকার বলবে, তারা ভারতীয় রাজাকার। আমি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলাম প্রমাণ করতে পারলে স্বেচ্ছায় জাতীয় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করব। কিন্তু কেউ তাঁর চ্যালেঞ্জ আজও গ্রহণ করেনি।’

উল্লেখ্য, গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাওলানা সাঈদীর পক্ষে পিরোজপুর, নাজিরপুর ও জিয়ানগরের অনেক প্রসিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা কাজ করেছেন, তাঁকে বিজয়ী করার জন্য নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। পিরোজপুরবাসী এর সাক্ষী। মাওলানা সাঈদী যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার হলে এসব মুক্তিযোদ্ধা কোনোক্রমেই তাঁর পক্ষাবলম্বন করতেন না।”

অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলামের উপস্থাপিত এ সকল যুক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আব্বাস দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭১ সালে কোনো ভূমিকা পালন করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ওনাকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী সরকার জুডিশিয়াল কিলিংয়ের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার মিথ্যা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। বিচারের নামে সরকারের এ মিথ্যা ও সাজানো নাটক দেশবাসী স্বাভাৱে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২০. আটাশ ফেব্রুয়ারির গণহত্যা

আব্দুস সাঈদীসহ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে বহুল আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধাপরাধের তদন্তের মাধ্যমে ১৯৫ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সেই তদন্ত রিপোর্টে কমিটি কোনো বেসামরিক লোককে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেনি। ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা জাতিকে জানিয়েছিল। কিন্তু সরকার এসব চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিচার না করে ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ত্রিপুরা (বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান) চুক্তির মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেয়।

২০১০ সালে একটি মহলের অন্যায় চাপে আওয়ামী সরকার স্বাধীনতার ৪০ বছর পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের বিচার শুরু করে। প্রকৃত অপরাধীদের ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসানো এবং বিচার কার্যক্রম অস্বচ্ছ ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এ বিচার কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করা হয়নি বলে দেশি-বিদেশি আইনজ্ঞদের অভিমত রয়েছে। তা ছাড়া বিচার প্রক্রিয়ার ওপর সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছে। ফলে এসব নিরপরাধ নেতৃবৃন্দের বিচারের রায় ঘোষণার পর সর্বস্তরের জনগণ তীব্র নিন্দা ও প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বিশেষ করে ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আব্দুস সাঈদীর মামলার রায় শোনার পর সারা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। ওনার রায়ের দিন সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের কাছে ফোন করে মানুষ তাদের উদ্বেগ-উৎকর্ষ প্রকাশ করতে থাকে। সবার মনে একই প্রশ্ন—‘আব্দুস সাঈদীর রায় কী হতে যাচ্ছে? ওনার যদি ফাঁসি হয়, তাহলে আমরা বেঁচে থেকে লাভ কী?’—এ কথা বলে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বেলা সাড়ে ১১টার পর থেকে উৎসুক জনতার নজর ছিল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের দিকে। মামলার রায় দেওয়া হবে জেনে ওইদিন নফল রোজা রেখেছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামপ্রিয় জনগণ। রায় ঘোষণার সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। ফাঁসির রায় ঘোষণার সংবাদ শুনে জ্ঞান হারিয়েছিল সাঈদীভক্ত অনেক মানুষ।

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ রায় প্রত্যাখ্যান করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। পাশাপাশি আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখসহ আমজনতা রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতাল-অবরোধ করে সারা দেশ অচল করে দেয়। এতে বেসামাল হয়ে ইসলামবিরোধী সরকার বিক্ষুব্ধ জনতার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার জন্য নির্মম নিপীড়ন চালায়।

সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার গুলি

জামায়াতে ইসলামী আহূত হরতাল চলাকালে সারা দেশের জনতার বিক্ষোভ মিছিলে নির্বিচারে গুলি করেছে পুলিশ ও সরকারি দলের ক্যাডার বাহিনী। তাদের গুলিতে শুধু ওইদিনই অর্ধ শতাধিক লোক শহীদ হয়। এতৎসঙ্গেও সরকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দমাতে পারেনি। সরকারের দমন-নিপীড়নের এ নৃশংসতার প্রতিক্রিয়ায় বিশিষ্টজন ও রাজনীতিবিদরা বলেন—

“স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গুলি ও নির্যাতনে এত মানুষের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। দেশব্যাপী এ হত্যাকাণ্ড নিছক হত্যা নয়। এটা কার্যত গণহত্যার শামিল। এ হত্যার জন্য সরকার তাদের দায়ভার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।”

সারা দেশে আওয়ামী লীগ সরকারের এ ভয়াবহ তাগুকের প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলো হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছিল।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে ছিলেন। চিকিৎসা শেষে ওইদিন রাত ৮:৫০ মিনিটে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় ফেরেন তিনি। বিমানবন্দরে তাঁকে ফুল দিয়ে নেতা-কর্মীরা স্বাগত জানাতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন—

“আমার দেশের জনগণকে যখন নির্বিচারে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে, তখন আমি এ ফুলেল শুভেচ্ছা চাই না।”

দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে বেগম খালেদা জিয়া বিমানবন্দর থেকে সোজা গুলশানে নিজের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আসেন। তিনি সেখানে দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত বৈঠক করেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন শুক্রবার বিকেল ৫টায় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে অশ্রুসজল কণ্ঠে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি বলেন—

“আমি স্তম্ভিত। আমি ক্ষুব্ধ। আমি গভীরভাবে মর্মান্বিত। নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর কোনো ভাষা আমার নেই।”

আন্তর্জাতিক মুফাসসিরে কুরআন, সাবেক সংসদ সদস্য ও জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্বাস আল-আওয়াদি হোসাইন সাঈদীর প্রতি দেওয়া অন্যায ফাঁসির রায়ের পর দেশজুড়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ ও সরকারি দলের ক্যাডারদের নির্বিচারে গুলি করে অর্ধ শতাধিক মানুষকে হত্যার প্রতিবাদ এবং দলের প্রতিক্রিয়া জানাতেই এ প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

‘দেশে আবারও চলছে পৈশাচিক গণহত্যা’ উল্লেখ করে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া বলেন—

“সরকার পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করছে। গণহত্যার পৈশাচিক তাগুবে মেতে উঠেছে সরকার। শিশু, বৃদ্ধ, নারী কেউই রেহাই পাচ্ছে না। মসজিদের মুসল্লি, ইমাম, খতিব ও আলেম-উলামাসহ সবাইকে হত্যা করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভিনদেশি হানাদাররা দেশের মানুষের ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্বাধীন দেশে এ গণহত্যা মেনে নেওয়া যায় না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্বিচারে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে এ গণহত্যা বন্ধ না করলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ।...বিচারের নামে সরকার ন্যায্যবিচারের পরিবেশ ধ্বংস করেছে। দেশের নিরাপত্তা এখন বিপন্ন। এ পরিস্থিতির দায় সরকারকে নিতে হবে।...বিচার প্রক্রিয়ার ওপর শাহবাগের বিক্ষোভের চাপ প্রয়োগকে সমর্থন করে, জাতিকে

বিভক্ত করে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়ে এবং নিজের দেশের নাগরিকদের ওপর বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় থাকার সকল নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। তারা ক্ষমতায় থাকলে দেশ আরও ভয়ংকর বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হবে। সে কারণে আমরা অনতিবিলম্বে এ রক্তপিপাসু খুনি সরকারের নিঃশর্ত পদত্যাগ দাবি করছি।”

চলমান সহিংসতা ও হতাহতের ঘটনাকে সরকারের ‘পৈশাচিক গণহত্যা’ বলে আখ্যায়িত করে ৩ মার্চ রাজধানীসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ এবং ৫ মার্চ মঙ্গলবার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করেন বেগম খালেদা জিয়া।

সারা দেশে নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদ ও মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মকবুল আহমাদ বলেন—

“আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রায় ঘোষণার পর সারা দেশে সাধারণ জনতা এ রায় প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। আর সরকারের পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ জনতার ওপর গুলি চালিয়ে ৫০ জনকে হত্যা করে।...সারা দেশে পুলিশের গুলিতে আহত হয় প্রায় ৩ হাজার মানুষ। তার মধ্যে ৫০০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সরকার নাগরিকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এ সরকারের হাতে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। সরকারের গুলির হাত থেকে শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পায়নি। কোনো যুদ্ধরত দেশেও এইভাবে একদিনে এত মানুষ নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়নি।”

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী বলেন—

“এ সরকার গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাস করে না। তারা যেভাবে দেশব্যাপী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তাতে অন্যদের মতো আমিও বাকরুদ্ধ। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কী বলব ভাবতেও পারছি না।...সরকার আজ ভারতের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যত খুশি

মানুষ মারছে। দেশ অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। পরিস্থিতি উত্তরণে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তা না হলে ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে।”

খেলাফত আন্দোলনের প্রধান আমীরে শরিয়ত মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ ২৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—

“একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীন মতপ্রকাশ করার সাংবিধানিক অধিকার আছে। সরকার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করার কারণেই দেশে এ ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার পর প্রতিবাদী নিরস্ত্র জনতাকে পাখির মতো গুলি করে গণহত্যা চালাচ্ছে সরকার। এই গণহত্যা প্রমাণ করেছে—এ সরকার খুনি বাকশালী সরকার। একদিকে সরকার শাহবাগ চত্বরে কিছু রাম-বাম, নাস্তিক-মুরতাদদের সমাবেশে সার্বিক রসদ জোগান দিচ্ছে; অন্যদিকে তাওহিদি জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। এটা কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণ হতে পারে না।”

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় দেশের ৫০ হাজার আলেম এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন—

“পবিত্র কুরআনের তাফসির করার কারণে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মিথ্যা ও সাজানো মামলায় সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করে সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেওয়া হয়েছে। তিনি দেশ-বিদেশে পবিত্র কুরআনের তাফসির করার মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বারবার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, তিনি কোনো মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত নন। অথচ সরকার হীন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার আয়োজন করেছে। অবিলম্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে বেকসুর খালাস দিন এবং এদেশের তাওহিদি জনতাকে শান্ত করুন।”

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি শফিউল আলম প্রধান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন—

“যারা শহীদ হয়েছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাদের রক্ত কখনোই বৃথা যাবে না।...স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এত মানুষের নিহত হওয়ার তথ্য আমার আর জানা নেই। এটি নিছক হত্যা নয়; এটা কার্যত মানবতাবিরোধী গণহত্যার শামিল। একে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। বালুর নিচে মুখ লুকিয়ে না রেখে এর প্রতিবাদ করতে হবে।”

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক রতন সারা দেশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় বলেন—

“এ হত্যাযজ্ঞের দায় সরকার এড়াতে পারবে না। সরকারের উচিত, দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবার সাথে সহনশীল আচরণ করা। তা না হলে দেশ সংঘাতের দিকে যাবে।”

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) চেয়ারম্যান খন্দকার গোলাম মোর্ত্তজা বলেন—

“এখন চলছে ক্রোধের রাজনীতি। পুলিশ নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে। যুদ্ধাপরাধীদের যেখানে বিচার করতে হয়, সেখানে বিনা বিচারে অর্ধ শতকের বেশি মানুষ হত্যা করা হয়েছে, এটা গণহত্যার শামিল।...যুদ্ধকালীন অবস্থা ছাড়া এত বড়ো হত্যাকাণ্ড রাষ্ট্রের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে।”

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (বাংলাদেশ ন্যাপ) চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি বলেছেন—

“সরকার এ কয়েক দিনে নির্বিচারে গণহত্যার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। কোনো সভ্য দেশে এ ধরনের অসভ্য ও বর্বর ঘটনা ঘটতে পারে না। একটি দেশ অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেসব নমুনা দেখা দেয়, বর্তমানে দেশে তার সবগুলোই ঘটছে।”

সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন—

“অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দেশ চলে যাচ্ছে। সরকার তার নিজস্ব অ্যাঞ্জেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যই এ হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। আমি শঙ্কিত,

দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের কী হবে! পুলিশ যেভাবে পাখির মতো গুলি করে মানুষ মারছে, তাতে সমস্যার সমাধান কখনোই হবে না।”

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোসলেম উদ্দিন ও মহাসচিব মোহাম্মদ ইকবাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন—

“আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ফাঁসির দণ্ডদেশ দিয়ে যে রায় প্রদান করেছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এটা বিচারকদের সুবিবেচনাগ্রসূত কোনো রায় নয়। বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার নীলনকশার অংশ হিসেবে এ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। শাহবাগে একদল নাস্তিক-মুরতাদকে পাহারা দিয়ে দিনের পর দিন সমাবেশ করতে দিচ্ছে ব্যস্ততম রাস্তার ওপর। তাদের দাবির মুখে সরকারের স্বার্থে এ রায় দেওয়া হয়েছে।”

রায়ে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে পিরোজপুরের সর্বস্তরের জনগণ। পিরোজপুরের অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও জনপ্রতিনিধিরা এই অন্যায় দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। পিরোজপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এমডি লিয়াকত হোসেন বাদশাহ জানান—

“১৯৭১ সালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। দেলাওয়ার সিকদার নামে পিরোজপুর গ্রামে একজন রাজাকার ছিল। তাকে মুক্তিযোদ্ধারা একান্তর সালেই হত্যা করে। তার পিতার নাম ছিল রসূল সিকদার। সাবেক এমপি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সম্পর্কে আমার বক্তব্য তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হওয়ার পূর্বেই পত্রিকায় দিয়েছিলাম। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে পিরোজপুরের ৫১জন মুক্তিযোদ্ধা ডাকযোগে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলাম। মাওলানা সাঈদী একজন ভালো লোক।”

এ রায়ের প্রতিক্রিয়া দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আব্বাস সাঈদীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসির রায় ঘোষণার বিরুদ্ধে ওইদিন দুপুরে মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছে ছাত্ররা। মিছিল-পূর্ব সমাবেশে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলেম, শরিয়াহ বিভাগের শিক্ষক ড. আতিয়া আবদুল মাবুদ বলেন—

“বাংলাদেশ সরকার ইসলামবিদ্বেষী শক্তিকে খুশি করতে মাওলানা সাঈদীকে ফাঁসির রায় দিয়েছে। এই অন্যায় রায়ের মাধ্যমে এই সরকার নতুন জমানায় ফেরাউন আর নমরুদের দলে নাম লেখাল।”

ড. আতিয়া আবদুল মাবুদ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমদের পক্ষ থেকে এই বিতর্কিত ট্রাইব্যুনালের সাজানো রায়ের নিন্দা জানান। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মিশরের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ইমাম ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সাঈদ আল জায়েদ। সমাবেশে মিশরীয় ছাত্রদের পাশাপাশি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চায়না, আলজেরিয়া, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, জর্ডান, ভারত-পাকিস্তানসহ অনেক দেশের ছাত্ররা বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে ‘সাঈদীর রায় মানি না’, ‘জালিম সরকার নিপাত যাক’ ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে উপস্থিত ছাত্রজনতা। সমাবেশ শেষে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে কথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ঘোষিত রায় প্রত্যাখ্যান এবং গণহত্যার প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ‘কোয়ালিশন অব বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন’। আল্লামা সাঈদীর রায়কে ‘প্রহসনের রায়’ উল্লেখ করে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মূনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ ছাড়া নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছেও স্মারকলিপি দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামপ্রিয় ও বিবেকবান মানুষেরা প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

এককথায় বলা যায়, দেশে ও বিদেশে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ রায় প্রত্যাখ্যান করে এবং দেশের সর্বত্র তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলে কুরআনপ্রেমী জনতা। এ প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সরকারি পেটোয়া বাহিনীর হাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেড় শতাধিক মানুষ শাহাদাত বরণ করে। পুলিশের গুলিতে আহত হয় প্রায় তিন হাজার মানুষ। এত হতাহতের পরও এ রায় বাতিলের দাবিতে জনগণ জীবন বাজি রেখে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লামা সাঈদী তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতার প্রভাবে মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিলেন। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের একটি প্রিয় নাম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

২১. বেকসুর খালাসের রায় দিলেন যে বিচারপতি

২০১৩ সালে ট্রাইব্যুনাল-১ ফাঁসির রায় দেওয়ার এক মাস পর ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপক্ষ ও আল্লামা সাঈদীর আইনজীবীগণ রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। দীর্ঘ সময় ধরে আপিল শুনানি শেষে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য দিন ধার্য করা হয়। ওইদিন আল্লামা সাঈদীর আপিলের রায় ১ নং তালিকায় ছিল।

সাধারণত আপিল বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে। কিন্তু সেদিন বিচারপতিরা কোর্টে উঠেছেন সকাল ১০:৩০টায়। তারা আল্লামা সাঈদীর রায় কী দেবেন, তা ঠিক করতে অতিরিক্ত আরও দেড় ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন। অবশেষে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের বিচারপতিগণ কোর্টে এসে আসন গ্রহণ করেন। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর দেওয়া রায়ের সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের মূল রায়টি লিখেছেন বিচারপতি এস কে সিনহা (পরবর্তী প্রধান বিচারপতি)। তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন তখনকার প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন ও বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। আর বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পক্ষে রায় দেন। তবে এ দুটি রায়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বেঞ্চের অপর বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব মিঞা (পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি) অভিযোগ থেকে আল্লামা সাঈদীকে বেকসুর খালাস দিয়ে আলাদা রায় দিয়েছেন। তিনি কেন খালাস দিয়েছেন, তার যুক্তি এ রায়ের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন—

“সাইদীর বিরুদ্ধে যে মামলা ও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি অভিযোগ আমি গভীরভাবে পড়েছি, পর্যবেক্ষণ করেছি, সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা সবকিছু দেখেছি। আমার কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সাইদীর বিরুদ্ধে আনীত একটি

অভিযোগও প্রমাণিত হয়নি। তিনি কোনো অভিযোগের সাথে সম্পৃক্তও নন। কাজেই তাকে সকল অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া হোক।”

আপিল বিভাগের এ রায়ের কয়েক দিন পর আল্লামা সাঈদীর পক্ষ থেকে রিভিউ করা হবে কি না, তা জানতে ওনার আইনজীবীগণ সাক্ষাৎ করতে কারাগারে গিয়েছিলেন। কারাগারে সাক্ষাতের বিবরণ তুলে ধরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন—

“কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি অফিস কক্ষে আল্লামা সাঈদী আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। রুমে ঢুকেই আমাদের সালাম জানালেন। সালামের জবাব ও কুশলাদি বিনিময়ের পর আমরা বললাম—‘আপনি রায় শুনেছেন? একজন বিচারপতি আপনাকে খালাস দিয়েছেন। আর বাকি দুটি রায় আপনার বিপক্ষে গেছে।’ এটুকু শোনার পর তিনি ওখানে সিজদায় গিয়ে বললেন—‘হে আল্লাহ! যে বিচারপতি আমাকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছেন, তুমি কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে খালাস দিয়ো।’ কত বড়ো উদার এবং বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন যে, তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে মোটেও বিলম্ব করেননি।”

আপিলের রায়ের পনেরো মাস পর ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ আদালত আল্লামা সাঈদীর রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্র বা আসামিপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে তা পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করতে পারে। রাষ্ট্রপক্ষ আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুদণ্ড চেয়ে রিভিউ আবেদন করে। অন্যদিকে খালাস চেয়ে আল্লামা সাঈদীর আইনজীবীরা রিভিউ আবেদন করেন। অতঃপর দুই দিন শুনানি করে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারকের বেঞ্চ দুটি রিভিউ আবেদনই খারিজ করে দেয়।

এ রায় দেওয়ার পরপরই আদালত প্রাঙ্গণে আল্লামা সাঈদীর আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন গণমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়ায় বলেন—

“আপিল বিভাগে আমরা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তি চেয়ে আবেদন করেছিলাম। প্রমাণ-দলিলাদি দিয়ে বলেছিলাম, ঘটনার সময় তিনি পিরোজপুরে ছিলেন না এবং এ রায় আপিল বিভাগের

এক বিচারপতি তাঁকে খালাস দিয়েছিলেন। একান্তরে নিহত পিরোজপুরের বিশাবালি হত্যার সাক্ষী সুখরঞ্জন বালি ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তার ভাইকে হত্যায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জড়িত ছিলেন না। এর পর তাকে তুলে নিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এসব বিষয় আমরা আদালতে উপস্থাপন করেছি।...

এ ছাড়া আরেকটি বিষয় আমরা আদালতে বলেছি। রাষ্ট্রপক্ষ যে রিভিউ করেছে, তা সঠিক হয়নি। তামাদি আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিভিউ আবেদন করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। ফলে তাদের রিভিউ বাতিলের আবেদন করেছিলাম। আপিল বিভাগ দুটি রিভিউ গুনেছেন। গুনানি শেষে তা খারিজ করে দিয়েছেন। এর ফলে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আমৃত্যু কারাদণ্ড বহাল থাকল।”

দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এ রায় শোনার পরপরই আদালত প্রাঙ্গণে আল্লামা সাঈদীর ছেলে পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার চেয়ারম্যান মাসুদ বিন সাঈদী গণমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বলেন—

“আপিল বিভাগের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমরা আল্লামা সাঈদীর মুক্তির জন্য যেসব প্রমাণ-দলিল দাখিল করেছি, তাতে তাঁর এক দিনের দণ্ডও হওয়ার কথা নয়।”

এ দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ফলে ৭৭ বছর বয়সি আল্লামা সাঈদীর কথিত যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ, তিনি পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবেন, এর পুরো সময় ওনাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাতে হবে—এ রায় দেওয়া হয়। তিনি যেন আর কখনও মুক্ত মানুষ হিসেবে কুরআনের দাওয়াত নিয়ে জনসম্মুখে আসতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করল আওয়ামী লীগ সরকার। তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ষড়যন্ত্র করে জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে যেভাবে একের পর এক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে, অনুরূপভাবে আল্লামা সাঈদীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছায় তাদের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আল্লামা সাঈদী বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে কারাগারে দুর্বিষহ জীবনযাপন করলেও তিনি

জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সহকর্মীদের পথ ধরে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বেঁচে ছিলেন। এটি একজন প্রকৃত মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٢﴾

“মুমিনদের মধ্যে একদল বান্দা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ শাহাদাতের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি।”

সূরা আহযাব : ২৩

২২. বেদনাবিধুর কারাজীবন

আব্দুলাম সাঈদী ২০১০ সালের ২৯ ডিসেম্বর শ্রেষ্ঠতার হওয়ার পর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে একজন সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে জেলকোড অনুযায়ী ডিভিশন-১ প্রাপ্ত বন্দি ছিলেন। ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলে তাঁর ডিভিশন বাতিল হয় এবং কারাগারে তিনি ফাঁসির আসামির কনডেম সেলে অন্তরীন থাকেন।

ডিভিশন-১ প্রাপ্ত বন্দিরা সাধারণ বন্দিদের তুলনায় অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। বিধি অনুসারে প্রথম শ্রেণির ডিভিশনপ্রাপ্ত প্রত্যেক বন্দির থাকার জন্য আলাদা রুম, খাট, টেবিল, চেয়ার, তোশক, বালিশ, তেল, চিরুনি, আয়না সবকিছুই থাকে। আর তার কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য আরেকজন বন্দিকে সেবক হিসেবে দেওয়া হয়। তা ছাড়া তিনি পড়ার জন্য বইপত্র এবং তিনটি দৈনিক পত্রিকা পান। সাধারণ বন্দিদের চেয়ে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দির খাওয়ার মানও ভালো থাকে।

আর কনডেম সেল হলো কারাগারের ভেতরে আলাদা কক্ষ, যেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের রাখা হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্ব পর্যন্ত বন্দিদের সেই সেলে থাকতে হয়। কারাগারে অন্য বন্দিদের চেয়ে কনডেম সেলে থাকা কয়েদিদের আচরণবিধিও ভিন্ন। কারাবিধি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের রায় হওয়ার পর একজন বন্দিকে কারাগারে সার্বক্ষণিক পাহারায় রাখা হয় এবং দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করার বিষয়ে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়ে থাকে। আলাদা কক্ষে রাখার বিষয়টি আইনে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও রেওয়াজ অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষ সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে কনডেম সেলের বন্দিদের একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। কনডেম সেল সাধারণত ১০ ফুট বাই ৬ ফুট আয়তনের হয়ে থাকে। ভেতরে আলো-বাতাস চলাচলের জন্য অন্যান্য সেলের তুলনায় অনেক ছোটো আকারের জানালা থাকে। এখানকার বন্দিরা মাসে এক দিন জেলগেটে

দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। আবার কনডেম সেল থেকে বছরের পর বছর বের হননি, এমন উদাহরণও আছে। এমনকি ছোটো ঘরের ভেতরে দীর্ঘ সময় থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

২০১৩ সাল থেকে আল্লামা সাঈদী কনডেম সেলে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিলেন। এ সময়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপিল ফাইল করলে আপিল বিভাগ শুনানি শেষে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে ট্রাইব্যুনালের রায় কমিয়ে যাবজ্জীবনের আদেশ প্রদান করে। আপিল বিভাগের এ আদেশের পর জেল কোডের ১৯২ পৃষ্ঠার ১৫ নং অধ্যায়ের ক্লাসিফিকেশন শিরোনামের অধীন ৬১৭ নম্বর বিধি মোতাবেক তিনি ডিভিশন-২ পাওয়ার অধিকারী হন। কারাগারে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তসহ বহুসংখ্যক ডিভিশন-২ প্রাপ্ত কয়েদি আছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো— সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর দীর্ঘ চার বছর পার হয়ে গেলেও কারা কর্তৃপক্ষ আল্লামা সাঈদীকে তাঁর প্রাপ্য ডিভিশন-২ প্রদান করেনি।

আল্লামা সাঈদীর মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার কারণে এ বিষয়ে আদালতে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ ছিল না। তাই ওনার ছেলে মাসুদ সাঈদী প্রাপ্য ডিভিশন-২ চেয়ে ৯ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে কারা মহাপরিদর্শকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর একটি আবেদন করেন। আবেদনপ্রাপ্তির পর কারা কর্তৃপক্ষ তাদের মতামত সহকারে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক স্বাক্ষরিত একটি পত্র ১১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর প্রেরণ করে। এরপর প্রায় তিন বছর কেটে যায়, কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ প্রসঙ্গে ওই সময় মাসুদ সাঈদী তার ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন, যার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো। তিনি লিখেন—

“এই দীর্ঘসময়ে বছবার মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেও এ আবেদনের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। ডিভিশন পাওয়া তো দূরের কথা, বরং এর মাঝে আঝা বেশ কয়েকবার কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আঝার চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেও আমরা বারবার ব্যর্থ হয়েছি। কারণ ‘ওপরের’ অনুমতি মেলেনি। নিদারুণ মনোকষ্ট নিয়ে আঝার ডিভিশন চেয়ে ৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে আবারও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব

বরাবরে আমি আবেদন করি। আমার আবেদনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের গ্রহণ ও বিতরণ শাখা গ্রহণ করে। আমার এ আবেদনের পর আবারও কেটে গেছে প্রায় তিন মাস। কিন্তু আগের মতোই এ আবেদনেরও কোনো জবাব কিংবা আক্বার চিকিৎসা বা ডিভিশনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কারা কর্তৃপক্ষ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মাঝে হঠাৎ করে ৩ মে, ২০১৮ তারিখে কারা কর্তৃপক্ষ আক্বাকে সকাল ১১টার দিকে চিকিৎসার নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রথমে আক্বাকে হাসপাতালের পরিচালকের ওয়েটিং রুমে আধা ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখার পর হাসপাতালের ইন্টার্নাল মেডিসিন বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আক্বার মেডিকেল ফাইল দেখে তাঁকে পাঠিয়ে দেন হাসপাতালের রিউমেটোলজি বিভাগে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আক্বাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য লিখিতভাবে কারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। প্রায় ২ ঘণ্টা ফোনলাপ শেষে ‘ওপরের নির্দেশ নেই’ জানিয়ে কারা কর্তৃপক্ষ দুপুর ৩টার দিকে আমার আক্বাকে বিনা চিকিৎসায় আবারও কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস করুন, সেদিন আক্বাকে হাসপাতালে ২-৩ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করানো ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। আক্বার সকল রোগের বর্ণনা শোনার পরও তাঁকে সামান্য একটি ওষুধ লিখেও কোনো প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়নি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আব্দুল্লাহ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবত ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। তিনি একই সাথে হৃদরোগেও আক্রান্ত। ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম তাঁর হার্টের করোনারি আর্টারিতে দুটি ব্লক ধরা পড়ে। একটিতে ৭০% এবং অন্যটিতে ৯০%। তখন তাঁর আর্টারিতে ২টি রিং স্থাপন করা হয়।

এরপর আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার পর ২০১২ সালে তিনি বৃকে তীব্র ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন আবারও আমার পিতার আর্টারিতে ৩টি ব্লক ধরা পড়ে। একটিতে ৯৯%, একটিতে ৯৫% এবং অন্যটিতে ৮০%। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তারের সিদ্ধান্তে তাঁর আর্টারিতে ৩টি রিং স্থাপন করা হয়। প্রথমের ২টি এবং পরের ৩টিসহ বর্তমানে সর্বমোট ৫টি রিং আমার পিতার করোনারি আর্টারিতে স্থাপন করা আছে। এছাড়া আমার আক্বা অর্ট্রাইটিস রোগেও আক্রান্ত। এ কারণে হাঁটু ও কোমরে রয়েছে তাঁর তীব্র ব্যথা। সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে তাঁকে

শ্রেফতারের পূর্বে তিনি নিয়মিত ফিজিওথেরাপি নিতেন। শ্রেফতার হওয়ার পর সেরকম থেরাপি নেওয়ার সুযোগ আর আমার পিতার হয়নি। যে কারণে তাঁর হাঁটু ও কোমরের ব্যথা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

আমার আক্বার বয়স এখন ৭৯ চলছে। এই বয়সে উপর্যুক্ত নানাবিধ শারীরিক সমস্যার পরও শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে তিনি ভালোই আছেন। তবে বয়স ও অসুস্থতাজনিত সমস্যার কারণে তিনি শারীরিক কষ্টে আছেন। এখন তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না। কারও সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে একা উঠে দাঁড়াতে পারেন না। ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখার জন্য তাঁর নিয়মিত হাঁটার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এখন তিনি কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটতেও পারেন না।

এমতাবস্থায় তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন শুধু এই কারণে নয়; বরং পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে পিতাকে অসুস্থতাজনিত শারীরিক কষ্ট থেকে সামান্য প্রশান্তি দেওয়ার প্রত্যাশায় ব্যাকুল এক সন্তান হিসেবে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমার পিতার চিকিৎসা ও প্রাপ্য ডিভিশন চেয়ে আবেদন করি। এই আবেদনের মধ্যে কোনো দল নেই, মত নেই, রাজনীতি নেই, কূটনীতিও নেই। আছে শুধু পিতার প্রতি সন্তানের ব্যাকুলতা, আছে শুধু পিতার প্রতি সন্তানের নিখাদ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। তবুও আমার এ আবেদনের মাঝে একটি মহল ‘রহস্য’ খুঁজে বেড়িয়েছেন—যা অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা এ ধরনের আবেদনের মাঝে ‘সরকারের সাথে আঁতাত’-এর গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ওইসব লোকের জন্য আমার ঘৃণা নয়; শুধু করুণাই হয়।”

ওপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ২০১৩ সালের ৮ জুলাই আল্লামা সাঈদীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কাশিমপুর কারাগারে স্থানান্তর করার পর দীর্ঘ সময় ওনার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করে বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে পরিবারের সান্নিধ্যে জীবনযাপনের সুযোগ থেকে ওনাকে বঞ্চিত রাখা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৩৯ বছর ডায়াবেটিসসহ মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় স্ট্রেসে করে রাজশাহী ও ঢাকার বিভিন্ন আদালতে মিথ্যা মামলায় ওনাকে হাজিরা দিতে আসতে হতো। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে প্রতিনিয়ত রোগে কষ্ট পেতেন। চিকিৎসকের পরামর্শে স্বল্প সময়ের জন্য ওনাকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালে আনা হলেও বৃদ্ধ বয়সে

জটিল রোগের যে চিকিৎসা করা প্রয়োজন ছিল, তা থেকে ওনাকে বঞ্চিত করা হতো। এভাবে আল্লামা সাঈদী দীর্ঘ ১৩ বছর কারাগারে চরম অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হন—যা একজন সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রেও মেনে নেওয়া যায় না।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে আল্লামা সাঈদীর কথিত বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর এটাই স্পষ্ট হলো—আদালতের আদেশে তাঁকে সারা জীবন কারাগারে কাটাতে হবে। তবে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট ছিল। আর তা হলো রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমা চেয়ে আবেদন করা। ইসলামী আন্দোলনের এ সিপাহসালার তিলে তিলে ১৩টি বছর চরম ধৈর্যের সাথে কারাগারে কাটিয়েছেন। অনেক কষ্ট ও দুঃখ-বেদনা সহ্য করেছেন। কিন্তু জালিম শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি। এক আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করেননি; সাহায্য চেয়ে হাত পাতেননি। এক্ষেত্রে তিনি দৃঢ় ঈমান ও মানসিক মজবুতি প্রদর্শন করেছেন। পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীগণ যখনই সাক্ষাৎ করেছেন, প্রতিবারই ওনাকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী পেয়েছেন। আল্লামা সাঈদী তাদের মাধ্যমে সব সময় সংগঠনের দায়িত্বশীল, কর্মীবৃন্দ ও দেশবাসীর কাছে এ মর্মে দুআ চেয়েছেন—

“আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঈমান ও ধৈর্যের সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীনের ওপর অবিচল রাখেন এবং জালিমের বন্দিশালা থেকে মুক্তি লাভ করে কুরআনের ময়দানেই শহীদ হিসেবে কবুল করেন।”

জালিমের কারাগারে মজলুমের এ দৃঢ়তা যেন পবিত্র কুরআনের সেই নির্দেশনা অনুসরণেরই উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالَّذِينَ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَيْثُؤُنَ كَثِيرٍ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١١٦﴾

“আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়াদা মানুষ লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে, তাতে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েনি। তারা হীনবলও হয়নি এবং তারা নতজানুও হয়নি। আর আল্লাহ তায়ালা (এ সকল) ধৈর্যশীল বান্দাদের ভালোবাসেন।” সূরা আলে ইমরান : ১৪৬

২৩. মমতাময়ী জননীর জানাযায়

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জেলজীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি ছিল ওনার মা, ছোটো ভাই ও বড়ো ছেলের ইন্তেকাল।

২০১০ সালে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে আল্লামা সাঈদী যখন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আওয়ামী বাকশালী সরকারের নির্যাতন ভোগ করছিলেন, তখন তাঁর গর্ভধারিণী মা ছেলের শোকে কাতর ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মহান রবের কাছে নিরপরাধ ছেলের জন্য দুআ করতে করতেই তাঁর দরবারে পাড়ি জমালেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লামা সাঈদী শত ব্যস্ততার মাঝেও মায়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। তাফসিরুল কুরআন মাহফিলগুলোতে লাখ লাখ শ্রোতাকে সাথে নিয়ে মোনাজাত করার সময়ও তিনি মায়ের জন্য দুআ করতে ভুলতেন না। তিনি একটি মাহফিলে মোনাজাত করতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগ ও দরদভরা মন নিয়ে মহান রবের দরবারে বলেছিলেন—

“হে রাক্বুল আলামিন! আমার জনম দুঃখিনী মাকে তুমি কবুল করো। তাঁকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করো। আমার ছাত্রজীবনে আমার মা ডিম, দুধ বিক্রি করে, লাউ বিক্রি করে জমানো টাকা আমার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আমার মা নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছেন। হে রাক্বুল আলামিন! তুমি আমার মাকে কবুল করো।”

এই মায়ের মৃত্যুর সময় বড়ো সন্তান হয়েও আল্লামা সাঈদী মায়ের পাশে থাকতে পারেননি এবং মা-ও তাঁর সন্তানকে কাছে পাননি। মায়ের ইন্তেকালের সাথে সাথেই পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছিল—যাতে আল্লামা সাঈদীকে তাঁর মায়ের লাশ দেখা এবং জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য কমপক্ষে ছয় ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মায়ের লাশ দেখতে এবং

পরিবারের সদস্যদের সাজুনা দিতে কিছু সময়ের জন্যও বাসায় যেতে দেয়নি। সেদিন আল্লামা সাঈদীকে কারাগার থেকে সরাসরি জানাযার মাঠে নিয়ে আসা হয়েছিল। অথচ তাঁর বাসভবন ও নামাজে জানাযার মাঠ মাত্র ২০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

আল্লামা সাঈদীর মা ইন্তেকাল করেন ২০১১ সালের ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায়। আল্লামা সাঈদীর প্যারোলে মুক্তির সময় অনিশ্চিত হওয়ার কারণে মায়ের জানাযার সময় আগেভাগে নির্দিষ্ট করা যায়নি। মানুষ অধীর আত্মহে অপেক্ষা করতে থাকে কখন আল্লামা সাঈদী আসবেন এবং তাঁর মায়ের জানাযার নামাজ পড়াবেন। কারণ, তাঁর মায়ের অন্তিম ইচ্ছা ছিল—বড়ো সন্তান আল্লামা সাঈদী তাঁর জানাযার নামাজ পড়াবেন। অবশেষে মায়ের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতার পরও আল্লামা সাঈদী পরদিন নামাজ পড়িয়েছিলেন।

জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮ অক্টোবর বিকাল ৫টায়। কিন্তু দুপুর ২টা থেকেই মানুষের ঢল নামে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে। বিকাল সাড়ে ৪টার সময় যখন সামনে-পেছনে র‍্যাব-পুলিশের কড়া প্রহরার মধ্যে আল্লামা সাঈদীকে বহনকারী গাড়ি মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে প্রবেশ করে, তখন মাঠে তিল ধারণের ঠাই ছিল না। জানাযার নামাজের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে মাঠ পার হয়ে পার্শ্ববর্তী শাহজাহানপুর ও রাজারবাগের রাস্তা পর্যন্ত।

আল্লামা সাঈদী মাঠে প্রবেশ করার সাথে সাথে আবেগাকুল জনতা কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং ‘আল্লাহ্ আকবার’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। আল্লামা সাঈদীকে একনজর দেখার জন্য জনতার আবেগ, আত্মহ ও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস জানাযার মাঠে অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করেছিল।

আমি তখন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারির দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলাম। আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমারও সেদিন আল্লামা সাঈদীর মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল। জানাযার মাঠে উপস্থিত জনতার ঢল নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী হিমশিম খাচ্ছিল। তখন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ আবেগঝরা কণ্ঠে মাইকে ঘোষণা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে কাতারবন্দি হওয়ার জন্য আহ্বান করছিলেন। কিন্তু জনগণ দীর্ঘদিন পর তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মহান

ব্যক্তিকে কাছে পেয়েও জালিম সরকারের জিজ্ঞাসে আবদ্ধ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে আমি দ্রুত মাইক হাতে নিই। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে, সেজন্য উপস্থিত জনতার উদ্দেশে মাইকে বারবার ঘোষণা করছিলাম—‘এখানে আমরা জানাযার নামাজ আদায়ের জন্য এসেছি, আপনারা আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কোনো কাজ করবেন না, যাতে জানাযার নামাজে কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।’

এর মধ্যে আল্লামা সাঈদী গাড়ি থেকে নেমে মাইকের সামনে এসে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়েন। অতঃপর তিনি উপস্থিত জনতার প্রতি আহ্বান জানান—‘আপনারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করবেন।’ এই একটি বাক্যই ছিল প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত আল্লামা সাঈদীর একমাত্র কথা। এর বাইরে তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে কোনো কথা বলার সুযোগ পাননি। কারণ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আল্লামা সাঈদীকে আসর ও জানাযার নামাজের জন্য মাত্র ৩০ মিনিট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। বিকাল ৪টা ৩৯ মিনিটে তাঁর ইমামতিতে সকলেই প্রথমে আসরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি মরহুমা মায়ের জন্য কান্নাজড়িত কণ্ঠে দুআ করেন। এতে তিনি বলেন—

“আমাদের আসরের নামাজ আল্লাহ কবুল করুন। আমার গর্ভধারিণী মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন। মুনকার-নাকিরের সওয়াল-জওয়াব তাঁর জন্য সহজ করে দিন। আমার মা আমার জন্য ভীষণ কষ্ট করেছেন। আল্লাহ, আমার মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। তাঁর সকল সাইয়িয়াতকে হাসানাত দিয়ে বদল করে দিন।”

উপস্থিত জনতা ‘আমিন’, ‘আমিন’ বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেখানে তখন এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়, যা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কারও পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব নয়।

দুআ শেষে জানাযার আগে মরহুমার পরিবারের পক্ষ থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে কথা বলেন আল্লামা সাঈদীর বড়ো ছেলে দিগন্ত টিভির ‘সরল পথ’ অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় উপস্থাপক ও উদীয়মান মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী। এ সময় তিনি বলেন—‘আমার দাদির অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী আমার বাবা তাঁর নামাজে জানাযায় ইমামতি করবেন। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আল্লাহ আমার বাবাকে ইমামতি করার

তাৎক্ষণিক দিয়েছেন।’ তিনি তাঁর দাদির জন্য সকলের কাছে দুআ কামনা করেন। এ সময় পুলিশ বারবার কথা শেষ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে এবং মাইক কেড়ে নেয়।

পরে ৪টা ৪৯ মিনিটে নামাজে জানাযা আত্মা মা সাঈদীর ইমামতিতে শুরু হয়। জানাযায় জামায়াতে ইসলামী, বিএনপিসহ চারদলীয় জোট, সমমনা দল, ইসলামী দল ও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, আলেম, পীর-মাশায়েখসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে আত্মা মা সাঈদী দুআ করতে চাইলে পুলিশ মাইক কেড়ে নেয় এবং উপস্থিত জনতাকে দ্রুত মাঠ ত্যাগ করার জন্য তাগিদ দিতে থাকে। এর মধ্যে শেষবারের মতো মাত্র একনজর মায়ের লাশ দেখার সুযোগ দিয়ে ঠিক ৫টায় পুলিশ আত্মা মা সাঈদীকে তড়িঘড়ি করে গাড়িতে উঠিয়ে কারাগারের উদ্দেশে রওনা হয়।

মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল র‍্যাব, পুলিশ, সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী পুলিশ এবং গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা। সবকিছু উপেক্ষা করেই এ সময় গাড়ির সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা হেঁটে রওনা হয় এবং স্লোগান দিতে থাকে। ‘সাইদী সাহেবের মুক্তি চাই-দিতে হবে’, ‘সাইদী সাহেবের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’, ‘অবৈধ ট্রাইব্যুনাল মানি না, মানব না’ ইত্যাদি। শোকাহত বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার মুহূর্মুহ স্লোগান ও আবেগের স্পর্শে আত্মা মা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে বহনকারী গাড়ি অগ্রসর হতে পারছিল না। কিন্তু সরকারি বাহিনীর শত উসকানির মধ্যেও ইসলামী আন্দোলনের বীর কর্মীদের পর্বতসম সবর ও উদারতার কারণে সেদিন কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি।

আত্মা মা সাঈদীর মরহুমা মায়ের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর নিজ জেলা পিরোজপুরে। সেখানে পুনরায় প্রথবার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় আত্মা মা সাঈদী ফাউন্ডেশন মাঠে, দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় টগড়া মাদরাসা ময়দানে এবং তৃতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি মাঠে। প্রতিটি জানাযাতেই জনতার বাধভাঙা জোয়ার নামে। এ সকল জানাযায় যাতে মুসল্লিরা আসতে না পারে, এজন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে পথে পথে বাধা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ফেরি ছেড়ে দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ রুটে বাস ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে রাখা হয়, নদী পারাপারের জন্য খেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, ট্রলারগুলো যাতে লোক পরিবহন না করে, এজন্য ট্রলার মালিকদের তা বন্ধ করে রাখতে বাধ্য করা হয়। এত বাধাবিপত্তি সৃষ্টির পরও প্রতিটি জানাযাই জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

আল্লামা সাঈদী কারাগারে অন্তরিন অবস্থাতেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তারপরও বন্দি সাঈদী এবং তাঁর মায়ের লাশকে সরকারের এত ভয় কেন? আল্লামা সাঈদীর মায়ের জানাযায় যারা এসেছেন, তাদের সাথে ওনার মায়ের কখনোই পরিচয় ছিল না। এ পর্দানশিন নারীর চেহারাও কেউ কোনো দিন দেখেনি। তারপরও জনতার এত বাঁধভাঙা জোয়ার কেন? এই জনতা আল্লামা সাঈদীর ওয়াজ শুনে জীবনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন গড়ার দীক্ষা পেয়েছে বলেই তাদের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। জানাযায় উপস্থিত লাখো মানুষের মধ্যে অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত কেউই তাঁর রক্তের আত্মীয় নয়, আল্লামা সাঈদীর প্রতি এ দেশের কোটি মানুষের হৃদয়ে যে অকৃত্রিম ভালোবাসা, তারই প্রকাশ জানাযায় এ উপস্থিতি।

আল্লামা সাঈদীর বড়ো ছেলে মাওলানা রাকীক বিন সাঈদী সেদিন পিরোজপুরের জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন রেখেছিলেন—‘আমার বাবার প্রতি অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি নাকি যুদ্ধাপরাধী, আপনারা কি এ কথা বিশ্বাস করেন?’

জানাযায় উপস্থিত জনতা সমন্বরে বলেছেন—‘না, তিনি কোনো অপরাধ করেননি।’

পিরোজপুর থেকে আল্লামা সাঈদী পরপর দুবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ চল্লিশ বছরে যার বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রকার অন্যায় কাজের প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি, হঠাৎ করে আওয়ামী সরকারের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার মিথ্যা উপাখ্যান রচনা করল। আল্লামা সাঈদী যদি অপরাধীই হতেন, তবে কেন তাঁর মায়ের জানাযায় এভাবে মানুষের ঢল নামে? কেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আল্লামা সাঈদী ও তাঁর মায়ের জন্য চোখের পানি ফেলে দুআ করে? তিনি যদি অপরাধীই হয়ে থাকেন, তবে কেন সরকার বন্দি সাঈদী ও তাঁর মায়ের লাশকে এত ভয় পায়? মূলত এ ভয়ের কারণ—সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আল্লামা সাঈদীর অবিচল আস্থা, এ পথে তাঁর দৃঢ় অবস্থান, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে আধিপত্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরদার ভূমিকা পালন এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। মূলত মিথ্যার চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে যারা আজ বিজয়ের অট্টহাসি দিচ্ছে, তাদের অট্টহাসিকে দ্বন্দ্বিতা করে দিয়ে সত্য একদিন উজ্জাসিত হবেই, ইনশাআল্লাহ।

বাপের কাঁধে ছেলের লাশ অভ্যস্ত ভারী

আল্লামা সাঈদীর মায়ের ইন্তেকালের ৮ মাসের মধ্যে পুনরায় শোকের মেঘে ঢেকে যায় সাঈদী-পরিবার। ২০১২ সালের ১৩ জুন আল্লামা সাঈদীর বড়ো ছেলে প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী (৪৭) ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রাফীক বিন সাঈদী তাঁর পিতার যোগ্য সন্তান হিসেবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কুরআনের তাফসির করতেন। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনিও বেশ জনপ্রিয় বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বেসরকারি টিভি চ্যানেল দিগন্ত টিভিতে ‘সরল পথ’ নামে একটি জনপ্রিয় ইসলামী অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন রাফীক বিন সাঈদী।

ক্যালেন্ডারের পাতায় ১৩ জুন, ২০১২ সাল, বুধবার। সেদিন আল্লামা সাঈদীর মামলার শুনানি ছিল। শুনানির সময় ট্রাইব্যুনালে রাফীক বিন সাঈদী উপস্থিত ছিলেন। শুনানির আগে তিনি তাঁর পিতার সাথে বেশ কিছু সময় কথাও বলেছেন। দুপুর ১টার দিকে শুনানির বিরতিকালে রাফীক বিন সাঈদী ট্রাইব্যুনালে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে বাইরে গাড়িতে বসানো হয়। গাড়িতে বসা অবস্থাতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরে দ্রুত তাঁকে বারডেম হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করলেও তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়নি। বিকেল পৌনে ৩টার দিকে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।

রাফীক বিন সাঈদীর ইন্তেকালের সংবাদ মুহূর্তেই দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। সেখানে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধুকে হারিয়ে এ সময় অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিকে অ্যাথুলেলে মরহুমের লাশ বারডেম থেকে ওনাদের শহীদবাগের বাসায় আনা হয়। এ সময় অ্যাথুলেলের সাথে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ও ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা রফিউদ্দিন আহমদসহ আমরা কয়েকজন পরিবারের সদস্যদের সাথে বাসায় আসি। তখন অনেকেই আল্লামা সাঈদীর বাসায় ভিড় করেন মরহুমের লাশ একনজর দেখার জন্য। এর মধ্যে লাশ গোসল করানোর পর পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে রাতে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়।

পরদিন ১৪ জুন, বৃহস্পতিবার রাফীক বিন সাঈদীর জানাযার নির্ধারিত স্থান মতিঝিল সরকারি বালক বিদ্যালয় মাঠে দুপুর থেকেই মানুষ আসতে শুরু করে। বিকেল যতই গড়াতে থাকে, জনতার ঢল ততই বাড়তে থাকে। বিকাল ৬টা ১০ মিনিটে আল্লামা সাঈদীকে বহনকারী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ির বহর এসে পৌঁছে। এ সময় পুরো মাঠজুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। তাকবির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। আল্লামা সাঈদীকে একনজর দেখার জন্য নিরাপত্তাবেটনী পেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল উপস্থিত জনতা।

আল্লামা সাঈদী প্রথমে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে চাইলে তা করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি রাফীক বিন সাঈদীর লাশটিও দেখতে দেওয়া হয়নি। ৬টা ১৩ মিনিটে মাইকে সমবেত জনতার উদ্দেশে সালাম জানান আল্লামা সাঈদী। তিনি আবেগাকুল কণ্ঠে বলেন—

“আমার কলিজার টুকরো আর নেই। বাপের কাঁধে ছেলের লাশ বহনের চেয়ে বড়ো কষ্ট আর কিছু হতে পারে না। বুলবুলের সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল বুধবার ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে। কে জানত এটাই হবে তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ!”

তিনি সরকারকে জালিম সরকার উল্লেখ করে বলেন—

“আমার কলিজার টুকরো সম্মান বুধবার মারা গেল, অথচ আমাকে আজ (বৃহস্পতিবার) আসরের পর জানানো হলো। হে আল্লাহ! তুমি এই জালিম সরকারের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করো।”

এ সময় বারবার তাঁকে কথা বলতে বাধা দিচ্ছিল পুলিশ। তিনি এ সময় বলেন—‘আমাকে বলতে দিন, আজ আমাকে বলতেই হবে।’

৬টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে কথা বলেন। উপস্থিত জনতা তাদের প্রিয় মজলুম নেতা ও মুফাসসিরের বক্তব্য শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। আল্লামা সাঈদী লাখে জনতার সামনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন—

“ও আল্লাহ, তোমার জাতের কসম! তোমার ইচ্ছাতের কসম! ১৯৭১ সালের কোনো কাদা আমার গায়ে লাগে নাই, লাগে নাই, লাগে নাই। নাস্তিক্যবাদীরা আমাকে সহ্য করতে পারে নাই। সেজন্য

কারাগারে বন্দি করে রেখেছে। আমি শাহাদাতের তামান্না করি। কিন্তু চোর, ডাকাত, হত্যাকারী, ধর্ষণকারী ইত্যাদি অপবাদ নিয়ে মরতে চাই না।”

এরপর সমবেত জনতার নিকট তিনি মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীর একমাত্র পুত্রসন্তান মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদীকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি এতিম নাতির জন্য দুআ চেয়ে বলেন—‘আল্লাহ যেন তাকে বড়ো আলেম বানান। জামানার হাদী করেন।’ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীর পুত্র এ সময় তার আক্কার জন্য সবার কাছে দুআ চায়। ৬টা ২০ মিনিটে তিনি মোনাজাত শুরু করেন। ৩ মিনিট মোনাজাতের পর আল্লামা সাঈদীর ইমামতিতে নামাজে জানাযা শুরু হয়।

জানাযায় জামায়াতে ইসলামী, বিএনপিসহ চারদলীয় জোট, সমমনা দল, ইসলামী দল ও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ অংশগ্রহণ করেন। একই মাঠে ঠিক আট মাস আগে ২০১১ সালের ২৮ অক্টোবর মাতা গুলনাহার সাঈদীর নামাজে জানাযায় ইমামতি করেছিলেন আল্লামা সাঈদী। এ সময় বাবার ডান পাশেই ছিলেন মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী। মাত্র আট মাস পর ১৪ জুন, ২০১২ তারিখে একই মাঠে আরেকটি নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এই জানাযার ইমামতিও করছিলেন আল্লামা সাঈদী। কিন্তু এবার রাফীক বিন সাঈদীর অবস্থান বাবার পাশে নয়; বরং সামনে কফিনের মধ্যে ছিল মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীর লাশ। পরদিন বাদ আসর মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীর শেষ নামাজে জানাযা পিরোজপুরে আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই মসজিদের পাশে তাকে শায়িত করা হয়।

এদিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছেলের জানাযার নামাজ শেষে জানাযার মাঠে তৈরি একটি অস্থায়ী তাঁবুতে আল্লামা সাঈদী পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের পর ওনাকে বহনকারী গাড়িবহর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে কারাগার পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি। পথিমধ্যে বৃষ্টি ব্যথা অনুভব করলে ওনাকে সরাসরি বিএসএমএমইউ (সাবেক পিজি) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সংবাদ পাওয়ার পর আমরা পিজি হাসপাতালে ছুটে যাই। সেখানেও জনতার ভিড়, কিন্তু পুলিশ কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না।

আমি একজন সংসদ সদস্য—এ পরিচয় পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার আমাকে ভেতরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। হাসপাতাল কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, আল্লামা সাঈদী কার্ডিয়াক ইউনিটে ভর্তি এবং পুলিশ প্রহরায় বেড়ে গিয়ে আছেন। সালাম দেওয়ার পর উনি উঠে বসেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে শোকাবহ কণ্ঠে বলেন—

“আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি বড়ো নিয়ামত দান করেছিলেন। আমি তাকে আলেম বানিয়েছি এবং তাফসিরের ময়দানের জন্য গড়ে তুলেছি। আট মাস আগে আমার মাকে হারিয়েছি, এখন বড়ো ছেলেকে হারালাম। আজ আমি বন্দি অবস্থায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। নিশ্চয় তিনি এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রেখেছেন। আমার ওপর কঠিন পরীক্ষা চলছে। সবাইকে দুআ করতে বলবেন—যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে সবরে জামিল দান করেন এবং শেকায়ে কামেলা দান করেন।”

সেদিন প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও অসুস্থতার মাঝেও আল্লামা সাঈদীর কথাবার্তায় আমি হতাশা ও দুর্বলতা দেখিনি; বরং তিনি আল্লাহ তায়ালায় প্রতি তাওয়াক্কুল রেখে তাঁর ফয়সালাকে অকপটে মেনে নিয়েছিলেন। আল্লামা সাঈদী ছিলেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী একজন মুমিন বান্দা। আর আল্লাহ তায়ালায় ওপর তাওয়াক্কুলের নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনোই হতাশ হয় না। আশাহত হলেও ভেঙে পড়ে না। বিপদ-মুসিবত, সংগ্রাম ও সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যেকোনো দুর্বিপাক, দুর্বোণ, সংকট, বিপদ-মুসিবতে আল্লাহ তায়ালায় ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে আশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। যত জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের ঝড়-তুফান আসুক, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। তাই আল্লাহ তায়ালায় ওপর তাওয়াক্কুল হলো ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مُوَلِّنَا ۚ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿৫১﴾

“(হে নবী) বলে দিন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদের ঘটবে না। তিনিই আমাদের মাওলা (অভিভাবক), আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা দরকার।” সূরা তাওবা : ৫১

আল্লাহ তায়াল্লা আরও বলেন—

وَيَزُقُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

“আর তাকে (তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তিকে) আল্লাহ তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ স্বীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।” সূরা তালাক : ৩

সহোদরের জানাযা পড়া হলো না

আল্লামা সাঈদী মা ও বড়ো ছেলেকে হারানোর পর কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ছোটো ভাই হুমায়ুন কবির সাঈদীকেও হারিয়েছেন। ১৮ জুন, ২০১৮ সালে সোমবার সকালে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক (বারডেম) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ছোটো ভাই হুমায়ুন কবির সাঈদী মৃত্যুর আগে অসিয়ত করেছিলেন, তাঁর জানাযার নামাজ যেন বড়ো ভাই আল্লামা সাঈদীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণে সোমবার মাসুদ সাঈদী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আল্লামা সাঈদীর প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের আবেদন গ্রহণ করে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানায়। এ আশায় পরদিন দুপুর দেড়টায় মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও জানাযার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বিকাল ৪টা পর্যন্ত মুক্তির কোনো সুরাহা না হওয়ায় আল্লামা সাঈদী ছোটো ভাইয়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরে শামীম সাঈদী তাঁর চাচা হুমায়ুন কবির সাঈদীর জানাযার নামাজ পড়ান।

মাসুদ সাঈদী জানান—‘আল্লামা সাঈদীর প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের আশ্বস্ত করলেও এক দিন পর মঙ্গলবার বিকাল ৪টা পর্যন্ত কোনো সুরাহা করেনি। সরকার আমাদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে। এ সরকারের কাছ থেকে কোনো মানবিক আচরণ আশা করা যায় না।’

ইসলাম মানব প্রকৃতির অনুকূল জীবনাদর্শ। তাই বাবা-মা, সন্তান ও ভাই-বোনদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সহজাত। এ সহজাত ভালোবাসার কারণে স্বজনের মৃত্যুতে মানুষের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় এবং চোখ অশ্রু ঝরায়। প্রিয়জন ও আপনজনের বিয়োগব্যথা মানুষের জন্য দারুণ বেদনাদায়ক। যে ভাই-বোনটি এত প্রিয় ছিল, উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতায় সকল শূন্যতা পূর্ণ করে রাখত, যে আক্বা-আম্মা এত আপন ছিলেন, মায়া-মমতার শীতল ছায়ায় বেষ্টন করে রেখেছিলেন; যে পুত্র-কন্যা কলিজার টুকরো ছিল, যাদের দেখলে, কথা শুনেলে প্রাণ জুড়িয়ে যেত; যে জীবনসঙ্গী ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়জন, যার সঙ্গ পৃথিবীর সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলার শক্তি জোগাত, হঠাৎ তার সকল বন্ধন ছিন্ন করা চিরবিদায়ের শোক মানুষের জন্য দুর্বহ। তাই সেই দুর্বহ বেদনার ভার সহিতে না পেরে মানুষের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হতে চায়। আল্লামা সাঈদীও মানবসমাজের একজন। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের পূর্বে ওনারও একটি সুন্দর পারিবারিক জীবন ছিল। যেখানে মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন ছিল। জালিমের কারাগারে বন্দি থাকায় দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয় মা, ছেলে, ভাইসহ অনেক আত্মীয়স্বজনকে তিনি এ সময়ে হারিয়েছেন। মনের আকাজক্ষা থাকলেও তিনি তাদের কষ্টের সময় পাশে থাকতে পারেননি। এ দুঃখ-বেদনাকে সঙ্গী করে কারাগারের একাকী জীবন অতিবাহিত করেছেন। জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তগুলোয় ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী ধৈর্যই ছিল ওনার উত্তম পাথর।

২৪. নিভে গেল কুরআনের আলো বিলানো এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ

আল্লামা সাঈদী বুকে ব্যথা অনুভব করলে কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষ ১৩ আগস্ট, ২০২৩ রোববার বিকেল ৫ টায় গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য ওনাকে অ্যাশুলেঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ওই অ্যাশুলেঙ্গে একজন হার্টের রোগীর জন্য উপযোগী কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি সাধারণ সিটে শুয়ে গাজীপুর থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কষ্ট করে ঢাকায় বিএসএমএমইউ (সাবেক পিজি হাসপাতালের) গেটে পৌছান।

দুই কারা পুলিশ সদস্যের কাঁধে ভর দিয়ে আল্লামা সাঈদী অ্যাশুলেঙ্গ থেকে নিচে নামেন। এত কষ্টের মাঝেও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি হাসিমুখে সবাইকে সালাম দেন এবং উপস্থিত সকলের খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই হাসির দৃশ্য কিছু তরুণ মিডিয়া কর্মী ও স্যোশাল মিডিয়ার কল্যাণে ত্বরিত গতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন পর প্রিয় ও শ্রদ্ধাস্পদ মানুষটির মুখে সুন্দর হাসির দৃশ্য দেখে বিশ্বের অগণিত ভক্ত ও গুণগ্রাহীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আল্লামার এমন হাসিমুখ দেখে কারও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

গাড়ি থেকে নামিয়ে আল্লামা সাঈদীকে হুইলচেয়ারে করে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিএসএমএমইউ-এর ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামানের অধীনে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে বিএসএমএমইউতে ভর্তি করা হয়। ওই সময় ডা. এস এম মোস্তফা জামান গণমাধ্যমকে জানান—‘মাওলানা সাঈদী আমার অধীনে কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সিতে ভর্তি রয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে আমি খবর পেয়ে এখানে এসেছি। বর্তমানে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রাথমিক ইসিজিতে উনার হার্ট

অ্যাটাক পাওয়া গেছে। এর আগেও উনার হাটে রিং পরানো হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, তাঁর প্রাইমারি পিসিও লাগবে। অর্থাৎ, সাথে সাথে রোগীকে এনজিওগ্রাম করে রিং বসানোর প্রয়োজন হতে পারে। তবে আপাতত লাগবে না বলে মনে হচ্ছে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে এখনও সুস্পষ্ট মন্তব্য করা যাচ্ছে না। তাঁকে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে রেখেছি।’

আল্লামা সাঈদীকে যখন গাজীপুর থেকে ঢাকায় বিএসএমএমইউ হাসপাতালে আনা হয়, তখন খবর পেয়ে সেখানে তাঁর দুই ছেলে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁদের অসুস্থ পিতার সাথে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মাসুদ সাঈদী তাঁর বাবাকে শুধু সালামটুকু দিতে পেরেছিলেন। হাসপাতালে ভর্তির পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও পিতার কোনো খবর তারা পাচ্ছিলেন না। তাই পেরেশান হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং জেল কর্তৃপক্ষের সাথে বারবার যোগাযোগ করার পরও পিতার সম্পর্কে কোনো তথ্য তারা পাননি। সাধারণত একজন অসুস্থ মানুষ আপনজনকে কাছে পেলে স্বস্তিবোধ করে থাকেন। কিন্তু আল্লামা সাঈদীর পরিবার ওনার কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেও সে সুযোগ পাননি। অজানা কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও পরিবারের সদস্যদের ওনার কাছ থেকে দূরে রাখা হয়। এমতাবস্থায় রাত ১২টার পর মাসুদ বিন সাঈদীর ফেসবুক স্ট্যাটাস ছিল এ রকম—

“যখন অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হচ্ছিল, তখন একঝলক ওই পবিত্র মুখ দেখেছি। সেই থেকে ইমার্জেন্সি হয়ে সিসিইউতে নেওয়ার পর শত চেষ্টা করেও আবার সাথে একটু দেখা করতে পারলাম না। জানতে পারলাম না তাঁর মুখে তাঁর কষ্টের কথা! এতটা নিষ্ঠুর মানুষ হয় কীভাবে? ইয়া রব... এই নিষ্ঠুরতার তুমি সাক্ষী থেক।”

তিনি আরও লিখেন—

“আল্লাহ রহম করার মালিক। আমরা আবার শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর পাচ্ছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন নিষ্ঠুর আচরণ করছে। তারা আমাদের কোনো তথ্য তো দিচ্ছেই না; আমাদের একরকম অসহায় করে রেখেছে। তারা কিছু একটা লুকাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। আমরা আবার আবারও হাট অ্যাটাকের খবর পাচ্ছি। আল্লাহ দয়া করো তুমি।”

এদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ১৪ আগস্ট, ২০২৩ গণমাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আহ্বান জানান—‘মানবিক কারণে আল্লামা সাঈদীকে মুক্তি দিয়ে পরিবারের তত্ত্বাবধানে ওনার পছন্দ অনুযায়ী মুক্ত পরিবেশে উন্নত চিকিৎসা ও সেবা গ্রহণের সুযোগ দিন।’ কিন্তু কোনো আহ্বান-অনুরোধে সাড়া দেয়নি জালিম সরকার ও প্রশাসন।

অবশেষে আল্লামা সাঈদী (রাহি.) বন্দি অবস্থায় হাসপাতালের শয্যায় ১৪ আগস্ট, ২০২৩ রাত ৮:৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিভে গেল বাংলার সবুজ জনপদে জনপদে কুরআনের আলো বিলানো এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অস্তিম শয্যায় জীবনের শেষ কথাটিও তিনি পরিবারের সদস্যদের বলে যেতে পারেননি! ইহজগৎ ছেড়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়স্বজনকে শেষবারের মতো দেখতে পাননি। এমন অমানবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁকে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিতে হয়েছে।

আল্লামা সাঈদীর মৃত্যু নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়। তিনি কি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, না এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকায়িত আছে? যেসব প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেসবের কোনো সুরাহা হয়নি। সে প্রশ্নগুলো উড়িয়ে দেওয়ার মতো তো নয়ই; বরং বেশ জোরালো—

ক) কাশিমপুর-১ কারাগারের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, আল্লামা সাঈদী কারাগারে অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—এমন তথ্য কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। কারাগার সূত্রগুলো জানায়, আল্লামা সাঈদীকে বিকালে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, তখন তিনি কারারক্ষীদের প্রশ্ন করেন—‘আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?’ জবাবে কারারক্ষীরা জানিয়েছিলেন—‘আপনার চেকআপের জন্য বাইরে হাসপাতালে নেওয়া হবে।’ সাথে সাথে তিনি আবার প্রশ্ন করেন—‘আমার পরিবারের সদস্যরা কি এই খবর জানে?’ তারা জবাবে বলেছিলেন—‘হ্যাঁ, তাদের জানানো হয়েছে।’ অথচ পরিবার সূত্রে জানা যায়, কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ সংবাদ তারা পাননি! তাহলে ওনার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পরিবারকে না জানানোর রহস্য কী?

খ) বিএসএমএমইউ হাসপাতালে আনার পর আল্লামা সাঈদীকে অন্যান্য দিনের মতোই হাস্যজ্বল দেখা গেছে। তিনি হাসপাতালে গাড়ি থেকে নেমে স্বভাবসুলভ দরাজ কণ্ঠে সালাম দিয়েছেন। উপস্থিত সবার সাথে কুশল বিনিময় করেছেন। বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক অসুস্থতাগুলোর বাইরে তাঁকে বিশেষ তেমন কোনো অসুস্থই মনে হয়নি। হাসপাতালে গাড়ি থেকে নামার দৃশ্য যারা দেখেছেন, তারা সকলেই একবাক্যে বলেছেন, ওনাকে গুরুতর অসুস্থ বলে বোঝা যায়নি। তিনি হাসিখুশি ও স্বাভাবিক ছিলেন। এদিকে অসুস্থতার কারণে ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলা হলেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হলো না কেন?

গ) হাসপাতালে আনার পর তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। আবার পরিবারের সদস্যরাও ওনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন কোন অজানা কারণে পরিবারের কাউকে তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি?

ঘ) হাসপাতালে আনার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার গণমাধ্যমকে জানান—‘সাঈদী সাহেবের ইচ্ছা অনুযায়ী বিএসএমএমইউ হাসপাতালে আনা হয়েছে।’ কিন্তু তিনি আদৌ হাসপাতালে আসতে চেয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর পরিবারের সদস্যরা ওনার সাথে দেখা করতে পারলে নিশ্চিত হওয়া যেত, আদৌ তাঁর ইচ্ছায় এখানে আনা হয়েছিল কি না?

ঙ) আল্লামা সাঈদীর চিকিৎসা চলাকালে সার্বক্ষণিক মিডিয়ায় কথা বলেছেন মেডিকেল টিমের সদস্য ডা. এস এম মোস্তফা জামান। আর এই ডাক্তার নিজেই ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শাহবাগে কথিত গণজাগরণ মধ্যে আল্লামা সাঈদীর ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করেছিলেন। তাই জনগণের কাছে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যে, তার কাছে আল্লামা সাঈদী সূচিকিৎসা পাওয়ার নিশ্চয়তা কতটুকু? এসব কারণে ডা. এস এম মোস্তফা জামান নিজের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডিও করেছেন। জিডি করার পর তিনি গণমাধ্যমে বলেন—‘প্রফেসর চৌধুরী মিশকাত আহমেদের তত্ত্বাবধানে আমি যুক্ত ছিলাম। আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ততটুকু দায়িত্ব পালন করেছি। মূল সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছিল বিভাগীয় চেয়ারম্যানের। বলা হচ্ছে প্রাইমারি

পিসিও বা এনজিওগ্রাম করানো গেলে তাঁকে বাঁচানো যেত। কিন্তু আসলে সবগুলো সিদ্ধান্ত নির্ভর করেছে আমার চেয়ারম্যানের ওপর, যার তত্ত্বাবধানে রোগী ভর্তি ছিল। তিনি প্রথমে বলেছিলেন পিসিও করানোর জন্য। তিনি আবার বললেন, এখন পিসিওর প্রয়োজন নেই। তার পরামর্শেই মূলত পিসিও করা হয়নি।’

আল্লামা সাঈদীর চিকিৎসার দায়িত্বরত ডাক্তারের এ বক্তব্য শুনে মানুষ আরও বেশি সংশয়ের মধ্যে পড়ে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। আর তা হলো— আল্লামা সাঈদীর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির হার্টের রোগের চিকিৎসা যেভাবে বিশেষ গুরুত্বের সাথে করা প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়নি কেন? চিকিৎসকদের মাঝে এত সমন্বয়হীনতা ছিল কেন? তা ছাড়া উন্নতমানের চিকিৎসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন রহস্যজনক কারণে অবহেলা করেছেন, তাও বোধগম্য নয়।

আমরা এ কথাই বিশ্বাস করি, প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত ফয়সালা অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে একদিন জনগণের এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটিয়ে ৮৪ বছর বয়সে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অগণিত মানুষকে অশ্রুসিক্ত করে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সফর শেষ করে মহান আল্লাহ তায়ালায় কাছে চলে যান। তাঁর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। শোকাহত জনতা ব্যথিত হৃদয়ে ছুটছিল বিএসএমএমইউ হাসপাতালের দিকে।

সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও টেলিভিশনে আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের সংবাদ প্রচার হতে থাকে। দেশে-বিদেশে মানুষের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়। সেইসাথে বাড়তে থাকে নানা উৎকর্ষ। তাঁর জানাযা কখন হবে, কোথায় হবে এবং দাফন-কাফন কোথায় হবে—এসব প্রশ্ন মানুষের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে। একই সাথে তাঁর জানাযা নিয়ে সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়েও চলে চাপা উত্তেজনা। সকলের মাঝে উদ্বেগ দেখা দেয়, সরকার হয়তো তাঁকে রাতের অন্ধকারেই নিজ গ্রামে দাফন করার জন্য বাধ্য করতে পারে। তাঁর জানাযা ও দাফন-কাফন সম্পর্কে জানার জন্য সংগঠন ও পরিবারের সাথে যোগাযোগ করছে সবাই। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য

পরিবারের পক্ষ থেকে সংগঠনের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে। এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বিস্তারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে প্রথম জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং পিরোজপুরে আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনের মাদরাসা প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাযার পর সেখানে দাফন করা হবে।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক শেষ হয় রাত ১০টায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে সমবেত জনতা ও সংগঠনের কর্মীদের দিকনির্দেশনা দেওয়া, মাইয়েতের গোসল, কফিন ও জানাযার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদির দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইনকে আমার সাথে যুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি ও মোবারক হোসাইন ভাই বিএসএমএমইউ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিই। সেখানে পৌঁছে দেখতে পাই, হাসপাতালের বাইরে শোকাহত জনতার ভিড়।

পুলিশ প্রশাসন হাসপাতালের সকল গেট আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে হাসপাতালে প্রবেশ করার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে মসজিদের পাশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আমি হতবাক হয়ে যাই। হাজার হাজার সমবেত মানুষ আবেগাপ্ত কণ্ঠে কান্না করছেন। কেউ কেউ উচ্চৈশ্বরে আবেদন জানাচ্ছেন ঢাকায় আল্লামা সাঈদীর জানাযার ব্যবস্থা করার জন্য। সেখানকার হৃদয়বিদারক দৃশ্য হাসপাতালের রোগীসহ সকলকে কাঁদিয়েছে। আমরাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।

হাজার হাজার মানুষের ভিড় অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাদের কাছে জানতে পারলাম, আল্লামা সাঈদীর লাশ হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় রাখা হয়েছে। হাসপাতালের প্রবেশপথ তালাবদ্ধ থাকায় ভেতরে প্রবেশ করা যাচ্ছিল না। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের সাথে আলাপ করার পর আমাদের পরিচয় পেয়ে ভেতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। একটু সামনে অগ্রসর হলে আল্লামা সাঈদীর ছেলে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাসুদ বিন সাঈদী আমাদের দেখে সামনে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার সাথে ছিলেন আল্লামা সাঈদীর ছোটো ছেলে নাসিম সাঈদী। তাদের সান্না

দিয়ে আল্লামা সাঈদীর বেডের কাছে যাই। কাপড় দিয়ে লাশ ঢেকে রাখা হয়েছিল। সেখানে দুজন পুলিশ সদস্য পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। আমরা যাওয়ার পর আল্লামা সাঈদীর চেহারার ওপর থেকে কাপড় সরানো হলো। সুন্দর মুচকি হাসির মতো নূরানী চেহারা আমাদের সামনে ভেসে উঠল। চোখ দুটি বন্ধ, যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি মনের আবেগে ওনার কপালে চুমু দিলাম। লাশের পাশে দাঁড়িয়ে মহান রাক্বুল আলামিনের কাছে দুআ করলাম। আল্লাহ তায়ালার এ নেককার বান্দার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে আপনজনের মতো ঘনিষ্ঠ থাকার সুযোগ পেয়ে মহান রাক্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

এর মধ্যে আমাদের আগমনের খবর পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার রমনা জোনের ডিসি এবং ডিবি রমনার এডিসি সেখানে আসেন। একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলেন তারা। তাদের সাথে কথা বলে মনে হলো—তারা আল্লামা সাঈদীর পোস্টমর্টেম করতে চান। আমরা জোরালো প্রতিবাদ করায় ডিসি সাহেব ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুককে বিষয়টি অবহিত করেন। ডিএমপি কমিশনার সাহেব আমার সাথে মোবাইলে কথা বলে জানালেন—‘জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পরিবারের সদস্যরা যদি এ ব্যাপারে লিখিত দেন, তাহলে আমরা পোস্টমর্টেম করাব না। আর রাতের মধ্যেই লাশ পিরোজপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের নির্দেশনা আছে। আপনাদের কর্মীদের হাসপাতাল এলাকা থেকে সরিয়ে নেন, নয়তো আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে আমরা তাদের সরানোর কাজে ইনভলব হতে চাই না।’ এ কথা শোনার পর আমি ডিএমপি কমিশনারকে আমাদের সংগঠনের সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম। এর মধ্যে প্রশাসনের মনোভাব সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে অবহিত করি। অতঃপর ওনার নির্দেশনা অনুযায়ী ডিএমপি কমিশনারকে সংগঠনের সিদ্ধান্ত পুনরায় জানাই। আর তা হলো—

ক. আল্লামা সাঈদীর লাশের পোস্টমর্টেম করা যাবে না। এজন্য লিখিত দেওয়ার প্রয়োজন হলে তাতে আমরা সম্মত আছি।

খ. ঢাকায় অবস্থানরত আল্লামা সাঈদীর আত্মীয়স্বজন এবং জনগণকে ঢাকায় জানাযার নামাজ পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

গ. কফিন শহীদবাগের বাসায় নিয়ে ওনার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের দেখার সুযোগ করে দিতে হবে।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর ডিএমপি কমিশনার জানালেন, আপনারা ঢাকায় জানাযা পড়তে চাইলে তা হাসপাতালের সামনে রাত ২টার মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন—‘সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল হওয়ার পূর্বে লাশ পিরোজপুরে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।’ এর পেছনে সরকারের যে দুরভিসন্ধি আছে, তা বুঝতে পেরে আমি তাকে জানিয়ে দিলাম—‘রাতের অন্ধকারে নয়, আমরা বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জানাযার আয়োজন করতে চাই। এর বিকল্প কোনো চিন্তার সুযোগ আমাদের নেই।’

মূলত প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল রাতের মধ্যে পিরোজপুরে কফিন নিয়ে গিয়ে সূর্য ওঠার পূর্বে দাফন সম্পন্ন করা—যাতে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া আল্লামা সাঈদীর কফিন দাফন করা যায়। আর দিনের বেলা ঢাকা ও পিরোজপুরে আল্লামা সাঈদীর জানাযা হলে লাখ লাখ মানুষের ঢল নামবে। এর ফলে আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যা মামলায় তাঁকে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছে, তা জাতির সামনে আরও একবার প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়ে যাবে। পাশাপাশি সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভ ও ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিশাল জনস্রোত ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

এদিকে আল্লামা সাঈদীর ছেলে মাসুদ বিন সাঈদীর কাছ থেকে লিখিত নেওয়ার পর পুলিশ প্রহরায় পোস্টমর্টেম ছাড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় গোসল করানোর কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস থাকায় সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংগঠন ১৬ আগস্ট বায়তুল মোকাররম মসজিদে বাদ জোহর জানাযার নামাজ আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী প্রশাসনকে অবহিত করে প্রস্তুতি চলতে থাকে। ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদটি প্রচার হয়ে যায়। এ কারণে সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ঢাকার জানাযার পরিকল্পনা পণ করার জন্য ষড়যন্ত্রের পথ খুঁজতে থাকে। প্রশাসন আমাদেরকে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে বসিয়ে রাখে। তখন পর্যন্ত আল্লামা সাঈদীর গোসলের কার্যক্রম শেষ হয়নি। এর মধ্যে হঠাৎ প্রশাসন দুরভিসন্ধিমূলকভাবে একটি লাশবাহী ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে ঢোকানোর চেষ্টা করলে উপস্থিত জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এটি মূলত পুলিশ প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে উত্তেজনা তৈরি করে উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য অজুহাত তৈরি করেছিল।

নিচে হট্টোগোলের শব্দ শুনে আমি দোতলা থেকে দ্রুত নিচে নেমে আসার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রশাসনের লোকজন আমাকে বাধা দেয়। তাদের আচরণে বোঝা গেল, তারা আমাদের ওপরের একটি কক্ষে আটকিয়ে রাখার চক্রান্ত করেছিল। তখন আমি জোর গলায় তাদের বলি—‘আপনারা যদি আমাকে এখানে আটক করে রাখেন, তাহলে জনগণ আরও বেশি উত্তেজিত হবে। তা ছাড়া বিক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করলে যেকোনো বড়ো ধরনের পরিস্থিতির জন্য আপনাদের দায়ভার নিতে হবে। তাই আপনারা ভেতরে অবস্থান করুন এবং আমাদের বাইরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করুন।’ এ কথা বলার পর তারা আমাদের নিচে নামার সুযোগ করে দেয়।

আমি নিচে নেমে এসে হ্যান্ডমাইক হাতে নিয়ে উপস্থিত জনতাকে সংগঠনের তিনটি সিদ্ধান্ত জানাই—

ক. আল্লামা সাঈদীর লাশের পোস্টমর্টেম করা হবে না। এখন ওনার গোসল ও কফিন পরানোর কাজ চলছে। পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে হাসপাতালের সামনে অবস্থান করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনারা সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সহযোগিতা করবেন।

খ. ঢাকায় জানাযার নামাজের বিষয়ে প্রশাসনের সাথে আলোচনা চলছে। আমরা ঘোষণা করেছি ১৬ আগস্ট বায়তুল মোকাররম মসজিদে বাদ জোহর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি, প্রশাসন সেক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে।

গ. প্রশাসন ১৬ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না দিলে আমরা ১৫ তারিখ দিনের বেলায় জানাযার নামাজ আদায় করে আমাদের প্রিয় নেতাকে বিদায় জানাব, ইনশাআল্লাহ। সৈরাচারী সরকারের দুর্ভিত্তি বাস্তবায়নের জন্য রাতের অন্ধকারে জানাযা পড়ার প্রস্তাব জনগণ মানবে না। আল্লামা সাঈদীকে দিনের আলোয় জানাযা শেষে সসম্মানে বিদায় না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করব।

এ ঘোষণা শোনার পর উত্তেজিত জনতার স্ফোভ কিছুটা প্রশমিত হয়। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে নিয়ে আমরা আল্লামা সাঈদীর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দুআ করি। সমবেত জনতা দুআয় शामिल হয়। মনের আবেগ ও

চোখের পানি ফেলে সকলে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করে। দুআ শেষে বাসায় ফিরে না গিয়ে জনগণ ধৈর্যের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে অবস্থান করতে থাকে।

অতঃপর আল্লামা সাঈদী (রাহি.)-এর গোসল ও কাফন পরানোর কার্যক্রম শেষ হলে প্রশাসন হাসপাতাল থেকে লাশ নিচে অপেক্ষমাণ অ্যাম্বুলেন্সে ওঠায় এবং রাতের অন্ধকারে পিরোজপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে অবস্থানরত জনতাকে সরানোর চেষ্টা করে। উপস্থিত জনতার প্রতিরোধের মুখে তারা বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। জনতার ভিড় ও পুলিশের ধাক্কাধাক্কিতে মাসুদ সাঈদী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত হাসপাতালের ভেতরে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ড. আব্দুল মান্নানকে তার দেখা-শুনার দায়িত্ব দিই। সেখানে এ সব উত্তেজনার মাঝে সকলে নির্ধুম রাত কাটায়।

সেদিন সকলের আকাঙ্ক্ষা ছিল আল্লামা সাঈদীকে একনজর দেখবে এবং ওনার কফিন সামনে রেখে জানাযা পড়বে। তা ছাড়া কফিন ঢাকার শহীদবাগের বাসায় নিয়ে সেখানে অপেক্ষমাণ ক্বীসহ পরিবারের সদস্যদের শেষবারের মতো দেখানোর ব্যবস্থা করবে। সেই প্রতীক্ষায় ফজর পর্যন্ত হাজারো আলেম-উলামা এবং আল্লামা সাঈদী ভক্ত রাত জেগে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেন এবং সেখানে জামায়াতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করেন।

আমি ফজর নামাজ শেষ করে তখনও জায়নামাজে বসে দুআয় शामिल ছিলাম। এ সময় ড. আব্দুল মান্নান ফোনে জানান—‘পুলিশের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের আর বেশি সময় দেবে না। তারা জোর করে লাশ নিয়ে যাবে। আপনি প্রশাসনকে বলে এখানে একটি জানাযার নামাজের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করতে পারেন।’ তখন তার কাছে মাসুদ সাঈদীর খোঁজ নিলাম। তিনি জানালেন—‘মাসুদ ভাই এখন সুস্থ।’

কিন্তু দুর্ভাগ্য! ফজরের পর যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো। ফজরের নামাজ শেষ হতে না হতেই কোনো কারণ ছাড়াই পুলিশ উপস্থিত জনতার ওপর টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুরো হাসপাতাল এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে। এর ফলে হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে অসুস্থ নারী-শিশুসহ

অনেক রোগীর চিকিৎসারে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। জানাযা পড়তে আসা অনেকেই গুরুতর আহত হন। আওয়ামী সরকারের এ জঘন্য বর্বরতা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সবাই প্রত্যক্ষ করেছে। অবশেষে পুলিশ অবস্থানরত জনতাকে জোরপূর্বক ছত্রভঙ্গ করে অমানবিক আচরণের মাধ্যমে কফিনের গাড়ি নিয়ে কড়া প্রহরায় পিরোজপুরের উদ্দেশে দ্রুত রওনা করে। অথচ প্রশাসনকে আমাদের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছিল আমাদের কর্মীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করবে। জানাযার নামাজ পড়েই চলে যাবে। আপনারা সেই সুযোগ করে দিন। তারা কথা দিয়ে কথা রাখেনি। কিন্তু আমরা ঠিকই কথা রেখেছি। আমাদের শোকাহত জনশক্তি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেছে। সারা রাত বিশৃঙ্খলা দূরের কথা, একটি ঢিলও কোথাও ছোড়া হয়নি। কিন্তু ফজরের পরে সরকারের অবৈধ নির্দেশ মানতে গিয়ে প্রশাসন যে আচরণ করেছে, তা শুধু নির্মমতা নয়; বরং বর্বরতার ন্যাকারজনক দৃষ্টান্ত।

আমাদের দায়িত্বশীলগণ এবং আল্লামা সাঈদীর সন্তান মাসুদ বিন সাঈদীসহ স্বজনরা সারা রাত সীমাহীন কষ্ট করেছেন। শোকাহত কর্মীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে গিয়ে একপর্যায়ে তাকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। কিন্তু পরের দিন সংবাদে দেখতে পেলাম—আমরা যারা মাসুদ সাঈদীসহ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আত্মা চেষ্টা চালিয়েছিলাম, তাদের আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর চাইতে বড়ো রাজনৈতিক নোংরামি ও প্রতিহিংসা আর কী হতে পারে?

প্রশাসনের সাথে আমাদের এ কথাও হয়েছিল যে, আল্লামা সাঈদীর সহধর্মিণী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য শহীদবাগের নিজ বাসায় অপেক্ষা করছেন। সেখানে আল্লামা সাঈদীর কফিন নিয়ে যাওয়া হবে এবং শেষবারের মতো দেখে তারা তাদের প্রিয় মানুষকে বিদায় জানাবেন। কিন্তু জালিম সরকার ওনার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের শেষ আকাজক্ষা ও অধিকার হরণ করে। সারা রাত অপেক্ষমাণ শোকাহত জনগণকেও জানাযা থেকে বঞ্চিত করে, যা একটি সভ্য সমাজের জন্য কলঙ্কজনক।

আল্লামা সাঈদীর চিকিৎসা ও লাশ নিয়ে সরকার যা করেছে, তা শুধু কলঙ্কজনকই নয়; বরং দেশের প্রচলিত আইনেরও পরিপন্থি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করার পর আল্লামা সাঈদীর সাজা কমিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে আমৃত্যু কারাদণ্ড করা হয়েছিল। আইনের বিধান অনুযায়ী আমৃত্যু সাজা দেওয়া

ব্যক্তি যখনই মৃত্যুবরণ করবেন, সেই মুহূর্তে থেকে তার লাশ সাজা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কারণ, তিনি তো আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। অর্থাৎ, আইনের দৃষ্টিতে তখন আল্লামা সাঈদীর লাশটি ছিল কারা কর্তৃপক্ষ বা সরকারের যেকোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং একটি পবিত্র আমানত। এই আমানত তাঁর ওয়ারিশদের নিকট সমর্পণ করাই ছিল কারা কর্তৃপক্ষের একমাত্র করণীয়। তাই সরকারের উচিত ছিল—আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা। ওনার ছেলে মাসুদ সাঈদী ওই সময় হাসপাতালেই উপস্থিত ছিলেন। জালাম সরকার এত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে যে, মাসুদ বিন সাঈদীকে একটিবারের জন্যও পিতার কাছে যেতে দেয়নি।

এ অমানবিকতার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। সরকারের এবং কারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল আল্লামা সাঈদী ইন্তেকাল করামাত্রই পরিবারের সদস্যদের ডেকে এনে লাশ হস্তান্তর করা। তারপর ওনার জানাযা কোথায় হবে, কখন হবে, ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদে হবে, না পিরোজপুরে হবে এবং কোথায় দাফন হবে, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকার ওনার পরিবারের। সরকার, প্রশাসন বা কারা কর্তৃপক্ষের এ কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা হস্তক্ষেপ করার কোনো নৈতিক অধিকার তো বটেই, আইনগত অধিকারও নেই। অথচ সরকার তাঁর জানাযার নামাজ ঢাকায় আদায় না করার জন্য বাধ্য করেছে। সরকারি কর্মকর্তা যারাই এ কাজ করেছেন, তারা আইন ভঙ্গ করেছেন। আইন ভঙ্গের জন্য একদিন না একদিন তাদেরও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

যেকোনো রাষ্ট্রে প্রশাসনিকভাবে যখন অন্যায়, জুলুম ও নির্যাতন হয়, তখন এর প্রধান দায়ভার সরকারের ওপর বর্তায়। কারণ, কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকে। কাজেই আল্লামা সাঈদীর প্রতি যে অন্যায় ও জুলুম করা হয়েছে, এর দায়দায়িত্ব সর্বপ্রথম বর্তমান ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ও সরকারপ্রধানের ওপর বর্তায়। এ জুলুমের বিচার একদিন হবেই হবে, ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা জুলুমের ব্যাপারে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

...وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٤﴾

“অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?”
সূরা শুআরা : ২২৭

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ
فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿١٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ؕ
وَأَفِدتُهُمْ هَوَاءَ ﴿١٣﴾

“আর জালিমরা যা করছে, আল্লাহকে সে বিষয়ে মোটেও
অমনোযোগী মনে করো না; বরং আল্লাহ তো সেসব জালিমদের
অবকাশ দিচ্ছেন ওইদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের চোখ পলকহীন
তাকিয়ে থাকবে। তারা মাথা তুলে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে,
তাদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে
শূন্য।” সূরা ইবরাহিম : ৪২-৪৩

২৫. জানাযায় জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার

১৫ আগস্ট, ২০২৩। ভোরবেলা সূর্য ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লামা সাঈদীর লাশবাহী গাড়ি পুলিশ প্রহরায় বিএসএমএমইউ হাসপাতাল থেকে পিরোজপুরের উদ্দেশে রওনা হয়। অপেক্ষমাণ জনতার কাছে স্পষ্ট হলো— তাদেরকে ঢাকায় জানাযা পড়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তখন প্রিয় মুফাসসির ও নেতার জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য জনতা ছুটে থাকে পিরোজপুরের পথে। নির্ধুম রাত কাটানো জনতার গন্তব্য এবার পিরোজপুর।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য যারা ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেছিলেন, তারাও গন্তব্য পরিবর্তন করে পিরোজপুর অভিমুখে পাড়ি জমান। পথিমধ্যে জানাযায় অংশগ্রহণকারী জনতাকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতা। পথে পথে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা গণপরিবহন ও ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারা বিভিন্ন স্থানে নিরপরাধ মানুষের ওপর হামলা চালায় এবং তাদের মোবাইল ফোন ও টাকাপয়সা ছিনতাই করে। ভাঙচুর করে অর্ধশতাব্দিক মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস। এতে আহত হন অর্ধশত মুসল্লি। আটক করা হয় ৩৬জন আল্লামা সাঈদী ভক্তকে। এসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা কোনো কিছুই জনতার স্রোতকে আটকাতে পারেনি। প্রিয় মানুষটিকে শেষবারের মতো দেখার জন্য বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো গন্তব্যের দিকে ছুটে যায় ইসলামপ্রিয় জনতা।

এদিকে আল্লামা সাঈদীর জানাযাকে কেন্দ্র করে পিরোজপুরের প্রশাসনের আচরণও ছিল চরম অমানবিক। আগের রাতে পিরোজপুরের জেলাপ্রশাসক জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীরকে ডেকে নিয়ে চাপের মুখে মুচলেকা দিতে বাধ্য করে যে, আল্লামা সাঈদীর কফিন আসার সাথে সাথেই যেন ওনার দাফন সম্পন্ন করা হয়। একইভাবে পিরোজপুরের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, লাশবাহী গাড়ি আসার মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে দাফন-কাফনের কাজ শেষ করতে হবে। অথচ দেশবাসী জানেন, পরিবারের পক্ষ থেকে

জানাযার নামাজের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল দুপুর ২টায়। পরিবারের ঘোষিত সময়ের পূর্বে জানাযা এবং দাফন-কাফনের জন্য প্রশাসনের এ ধরনের চাপ ছিল অন্যায় ও আইনবহির্ভূত।

সারা দেশের মানুষের মতো নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে পিরোজপুরের মানুষ। সকাল থেকে আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। মানুষের ভেতরে তীব্র উত্তেজনা ও আত্মহ কাজ করতে থাকে—কখন এসে পৌছবে তাদের প্রিয় নেতার লাশ? অবশেষে শত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১৪ বছর পর নিজ হাতে গড়া স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে এসে পৌছান আল্লামা সাঈদী। তবে তিনি আগের মতো নজরকাড়া ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হাসিমুখে নয়, তিনি এলেন লাঞ্ছিত জনতাকে চোখের পানিতে ভাসিয়ে লাশ হয়ে। এ সময় আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন মাঠ পূর্ণ হয়ে পাশের কয়েক কিলোমিটার সড়কে লাঞ্ছিত মুসল্লি অবস্থান নেয়।

মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে লাশবাহী গাড়ি আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনে ঢুকতে পারছিল না। প্রায় আধাঘণ্টা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পরে তাফহীমুল কুরআন আলিয়া মাদরাসার সামনে এসে প্রিয় নেতার লাশবাহী গাড়ি থামে। তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে উপস্থিত জনতা। সেখানে সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিবেশের। এলাকাজুড়ে ছিল শোকের আবহ। তখন সেখানে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কথিত ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের’ মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী সুখরঞ্জন বালিও উপস্থিত হন। তিনি একটি টিভির লাইভে বলেন—‘আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি সাঈদী ফাউন্ডেশনে এসেছি। আমার ভাইয়ের হত্যা মামলায় আমি সাক্ষী। আমি যেটা জানি, সেটিই স্বীকারোক্তি দিচ্ছি—১৯৭১ সালে আমার ভাই বিশাবালি হত্যায় আল্লামা সাঈদী জড়িত ছিলেন না।’ এ কথাগুলো বলার সময় তিনি আবেগাপ্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

আল্লামা সাঈদীর লাশবাহী গাড়ি সকাল ১০টায় পিরোজপুর এসে পৌছলেও পথে নানা বিড়ম্বনার কারণে সাঈদীপুত্র মাসুদ সাঈদী এসে পৌছতে অনেক সময় লাগে। সকাল থেকে প্রশাসন ছিল ব্যাপক তৎপর। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও জেলাপ্রশাসন দ্রুত জানাযা শেষ করার জন্য বারবার চাপ দিতে থাকে। অন্যদিকে জনতা আল্লামা সাঈদীর সন্তানদের উপস্থিতি ছাড়া জানাযা সম্পন্ন করতে রাজি হচ্ছিল না। পুলিশের চাপে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কয়েকবার চেষ্টা করেও জানাযা শুরু করতে পারেননি। অবশেষে বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদের

মুখে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে মাসুদ সাঈদী এসে পৌঁছলে মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। অতঃপর তিনি সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি বলেন—

“আমার বাবা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা জানতে পেরে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম। শত চেষ্টা করেও অসুস্থ পিতার মুখখানা একবারের জন্যও দেখতে দেওয়া হয়নি। এ সময় আমি পাগলের মতো হাসপাতালে বারান্দায় এদিক-সেদিক ছুটে বেড়িয়েছি। কিন্তু এতে প্রশাসনের কোনোমতে মন গেলেনি। অবশেষে আমি এশার নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। আমি আসার সাথে সাথে জানানো হয়, আমার পিতা আর বেঁচে নেই।”

মাসুদ সাঈদীর বক্তব্যে উপস্থিত জনতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ সময় মাসুদ সাঈদী পিরোজপুরবাসীর উদ্দেশে জানতে চান—‘আপনারা আমার বাবাকে দেখেছেন, আপনারাই বলুন—তিনি দোষী কি না?’ লাঞ্ছিত জনতা সম্মুখে সাক্ষ্য দেন—‘আল্লামা সাঈদী নির্দোষ।’ মাসুদ সাঈদী ছেলে হিসেবেও তার বাবাকে নির্দোষ দাবি করে সাক্ষ্য দেন। মাসুদ সাঈদী আল্লাহর কাছে তার নির্দোষ পিতার ওপর সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিচার চান।

অতঃপর আল্লামা সাঈদীর জানাযাপূর্ব এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন—

“আল্লামা সাঈদী কুরআনের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত চেষ্টা বেড়িয়েছেন। তিনি কুরআনের আইনকে বাস্তবায়নের জন্য বিরতিহীন ছুটে বেড়িয়েছেন। আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।”

ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াতের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর বেলা ১টা ১০ মিনিটে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবারের অনুরোধে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান জানাযায় ইমামতি করেন। আল্লামা সাঈদীর নামাজে জানাযায় আলেম-উলামা, বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের নেতা-কর্মী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লাখ লাখ সাধারণ মানুষ শরিক হন। বৈরী পরিবেশ এবং পদে পদে শঙ্কা ও বাধা সত্ত্বেও আল্লামা সাঈদীকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য লাখো মানুষের ঢল নামে।

আল্লামা সাঈদীর ইন্ডেকালের সময় ওনার মেজো ছেলে শামীম সাঈদী দেশের বাইরে ছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি সাথে সাথে দেশে ফেরার জন্য রওনা হন। শত অনিশ্চয়তার মাঝে তিনি পিরোজপুর এসে উপস্থিত হলে তার ইমামতিতে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বার জানাযার নামাজ যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন তা দেখে অনুভব করা কঠিন ছিল যে, মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্বে এখানে মূল নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় জানাযাতেও মাঠে-রাস্তায় তিল ধারণের ঠাই ছিল না। অবশেষে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বায়তুল হামদ জামে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে বড়ো ছেলে মরহুম রাফীক বিন সাঈদীর কবরের পাশে বিকাল ৪টায় আল্লামা সাঈদীকে দাফন করা হয়। লাখো মানুষের অশ্রুকাतर কান্নার রোলের মধ্য দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হয় কুরআনের মহান খাদেম ও প্রিয় নেতাকে।

২৬. গায়েবানা জানাযায় বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা

আল্লামা সাঈদীর জানাযায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তারা স্থানীয়ভাবে গায়েবানা জানাযার আয়োজন করেন। সারা দেশে এসব গায়েবানা জানাযায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাযায় অংশগ্রহণকারী মুসল্লিদের ওপর ন্যাকারজনকভাবে হামলা চালায় এবং অনেককে গ্রেফতার করে।

১৪ আগস্ট রাতের ঘোষণা অনুযায়ী ১৬ আগস্ট বাদ জোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন—‘১৬ আগস্ট বায়তুল মোকাররমে সাঈদীর গায়েবানা জানাযা করতে দেওয়া হবে না।’ পুলিশ কমিশনারের এ ধরনের হীন বক্তব্য জাতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সাধারণ মুসল্লিরা গায়েবানা জানাযার নামাজ পড়ার উদ্যোগ নিলে পুলিশ হামলা চালায় এবং কয়েকজন মুসল্লিকে গ্রেফতার করে।

চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে ইসলামপ্রিয় জনতা গায়েবানা জানাযার উদ্যোগ নিলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশ উপস্থিত মুসল্লিদের ওপর গুলি ছুড়লে ২০ জনের বেশি মুসল্লি আহত হয় এবং ৩০ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশপ্রশাসন।

কক্সবাজার জেলা সদর ও চকরিয়া উপজেলায় আল্লামা সাঈদীর গায়েবানা জানাযার আয়োজন করা হলে সেখানেও পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে চকরিয়া পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের জামায়াতনেতা ফোরকান উদ্দিন শাহাদাত বরণ করেন এবং অনেকেই আহত হন।

সিলেটে স্মরণকালের ঐতিহাসিক গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেও পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পরের

দুদিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দুই শতাধিক নেতা-কর্মীকে খেঁফতার করা হয়। এ ছাড়া ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহানগরীতে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ইসলামপ্রিয় মানুষ আল্লামা সাঈদীর গায়েবানা জানাযা আদায় করে।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আলেম-উলামা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আল্লামা সাঈদীর ভক্ত-অনুরক্তরা গায়েবানা জানাযায় অংশগ্রহণ করে। তুরস্কের ঐতিহাসিক ফাতিহ মসজিদ এবং আঙ্কারার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হাজি বায়রাম ভেলি মসজিদ, রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের কেন্দ্রীয় মসজিদ ‘মসজিদে আর রহমান’-এ শাইখ আহমাদ বাইয়ুমির ইমামতিতে আল্লামা সাঈদীর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে সামশেরগঞ্জের লোহরপুর ঈদগাহ ময়দান, লন্ডন আলতাব আলী পার্ক, বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি নিউইয়র্ক, মালয়েশিয়া, সুইডেনের স্টকহোম, গোথেনবার্গ ও মালমো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালির মিলান শহর, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল সেন্ট্রাল মসজিদ, সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রদেশ, মক্কা-মদিনা ও মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা পৃথিবীর অসংখ্য দেশে ও শহর-নগরে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

দেশ-বিদেশে বিশিষ্টজনদের শোক প্রকাশ

আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পর দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান তাঁর শোকবাণীতে বলেন—

“আল্লামা সাঈদী অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় কুরআনের খেদমত করেছেন। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন মহাশয় আল কুরআনের তাফসিরের জন্য। তাঁর তাফসির শুনে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে তিনি কুরআনের মাহফিল করে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছেন। বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর যৌবন কাটিয়েছেন কুরআনের তাফসিরের ময়দানে আর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন কারাগারে।...

ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন এ মহান দাঈ ইলাহী। সরকারের জুলুম-নির্যাতন তাঁকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মিথ্যা ও ষড়ন্ত্রমূলক মামলায় তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়ে তাঁর ওপর চরম অন্যায় করা হয়েছে। তাঁর ইন্তেকাল বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর এ শূন্যস্থান সহজে পূরণ হওয়ার নয়। আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর শূন্যতা কাটিয়ে ওঠার তাওফিক দিন, আমিন।”

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এক শোকবাণীতে বলেন—

“এই মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যা দেশবাসীকে ব্যথিত করেছে। তাঁর মতো একজন ইসলামিক স্কলার এবং সত্য উচ্চারণে নিষ্ঠীক মানুষের পৃথিবী থেকে চলে যাওয়াতে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হলো। ইসলামের জন্য তাঁর অবদান মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। রাজরোষে পড়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সরকারি ষড়যন্ত্রে বিচারিক হত্যার শিকার হয়েছেন। সহজ-সরল ভাষায় ইসলামী জ্ঞানের প্রচারে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে বরণীয় ব্যক্তিত্ব। সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদেও তিনি তাঁর বাগিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি এমন একজন সম্মানিত আলেম, যাকে দেশের মানুষ সব সময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।”

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন—

“কারাবন্দি অবস্থায় আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যু গভীর শোকাবহ। এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী পণ্ডিত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ইসলামের আলোকিত পথে। ক্ষমতাসীন শক্তি তাঁকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি তাঁর নিজস্ব মতাদর্শে ছিলেন অকম্প-অবিচল। ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতি সহমর্মী এই মানুষটি জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত ইসলামী জ্ঞানের চর্চা ও প্রচারে নিজেই নিবেদিত রেখেছিলেন।...

দেশ ও মানুষের জন্য তিনি কাজ করেছেন নিরলসভাবে। জাতীয় সংসদেও তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও তেজস্বী বক্তা। মরহুম সাঈদী ছিলেন মৃদুভাষী ও সৌজন্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

গুরুতর অসুস্থ মরহুম দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গত ১৩ বছর বন্দি অবস্থায় থাকলেও তাঁকে কোনো সুচিকিৎসা দেওয়া হয়নি। তাঁর মৃত্যু শৈবশাসনের এক নির্দয় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।”

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর আব্দুল্লাহ শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব আব্দুল্লাহ শাইখ সাজিদুর রহমান বলেন—

“মাওলানা সাঈদী (রাহি.) এ দেশের ইসলামী অঙ্গনের অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিশ্ববরণ্য ও জননন্দিত এ ইসলামী চিন্তাবিদে দাওয়াতি খেদমতের গণ্ডি শুধু দেশের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি দেশ-বিদেশে কুরআনের বাণী প্রচারের মাধ্যমে কোটি কোটি কুরআনপ্রেমীর হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন।”

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর মুফতি রেজাউল করীম বলেন—

“হাদিসে একজন আলেমের মৃত্যুকে গোটা পৃথিবীর মৃত্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, সাঈদী সাহেবের মৃত্যুতে পৃথিবী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে কুরআনের আবেদনকে জনমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামের রাজনৈতিক উত্থানকে সমুন্নত করতে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।”

আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন—

“মাওলানা সাঈদী এ দেশের গণমানুষের নিকট ইসলামের মর্মবাণী পৌছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রচলিত কিচ্ছা-কাহিনির পরিবর্তে ওয়াজের ময়দানে এক পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ধারা তিনি চালু করেছেন। শিরক-বিদআতসহ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অন্যদের তুলনায় তাঁর অবস্থান ছিল অনেক সুস্পষ্ট।”

শাইখুল হাদীস পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাওলানা মাহফুজুল হক বলেন—

“মাওলানা সাঈদী (রাহি.)-এর কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যু জাতির জন্য খুবই হৃদয়বিদারক এক স্মৃতি হয়ে থাকবে।”

চট্টগ্রাম জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম আল্লামা সুলতান যওক নদভী বলেন—

“মাওলানা সাঈদীর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি খুবই ব্যথিত ও মর্ষাহত হয়েছি। তিনি ছিলেন ধীনের একজন মুখলিস দাঈ। তাঁর হাতে বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসেছে।”

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রধান আল্লামা আতাউল্লাহ হাফেজী ও মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী বলেন—

“যুগ যুগ ধরে আল্লামা সাঈদী দেশ ও বিদেশে কুরআনের তাকসির করে লাখ লাখ মানুষের নিকট পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী পৌছিয়েছেন। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দেশে-বিদেশে সফর করেছেন। তাঁর কাছে অনেক অমুসলিম কালেমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।”

ড. এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী বলেন—

“তিনি সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল সকল প্রকার কাফের, মুশরিক, রাম-বামদের বিরুদ্ধে বাক্যবুদ্ধে রত ছিলেন।”

আস সুন্নাহ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শাইখ আহমাদুল্লাহ আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পরপর তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুকে লিখেছেন—

“বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।”

জনপ্রিয় ইসলামী আলোচক ড. মিজানুর রহমান আজহারী নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আল্লামা সাঈদীকে একজন কিংবদন্তি আখ্যা দিয়ে বলেন—

“একজন কিংবদন্তির বিদায়! একজন আল্লামার বিদায়! কুরআনের পাখি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আল্লাহর জিম্মায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধীনের একনিষ্ঠ এ খাদিমকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন।”

আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে শোক প্রকাশ

আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে আন্তর্জাতিক পরিসরেও শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী ইসলামপ্রিয় জনতা, ইসলামী রাজনৈতিক দল, সংস্থা-সংগঠন, বিশিষ্ট আলেম, গবেষক ও দাঈগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

অন্যতম প্রভাবশালী ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমিন আল্লামা সাঈদীর ইত্তেফালে শোক প্রকাশ করে বলেন—

“আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের পথে দীর্ঘ এক জীবন কাটানোর মাধ্যমে আল্লামা সাঈদী ইত্তেফাল করেছেন।”

আলিম ও ইসলামিক স্কলারদের বিশ্বজনীন সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলার্সের সেক্রেটারি ড. আলী কারাদাগি বলেন—

“আল্লামা সাঈদী কুরআনি মূল্যবোধ প্রচলনে এবং কুরআনি সমাজের প্রসারে দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য সভা-সম্মেলন করেছেন। তিনি ইসলাম ও জনগণের পক্ষে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রেখেছেন।”

ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাঈল হানিয়া শোকবার্তায় বলেন—

“হামাস অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বিশিষ্ট দাঈ, অনলবর্ষী বক্তা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ইত্তেফালের সংবাদ গ্রহণ করছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন ও জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন।

মালয়েশিয়ার প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দল পাস-এর সভাপতি আবদুল হাদি আওয়াং শোকবার্তায় বলেন—

“একজন সংসদ সদস্য এবং আল কুরআনের একজন দাঈ হিসেবে আল্লামা সাঈদীর অবদানের আমরা আন্তরিক স্বীকৃতি দিচ্ছি।”

পাকিস্তানের লাহোরের মানসুরাতে আল্লামা সাঈদীর স্মরণে আয়োজিত সেমিনারে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর সিরাজুল ইসলাম বলেন—

“আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) একজন প্রখ্যাত আলেম, মুফাসসিরে কুরআন, জনপ্রিয় বক্তা এবং খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক স্কলার ছিলেন।”

তুরস্কের রাজনৈতিক দল সাদাত পার্টি শোকবার্তায় বলেন—

“একজন বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন ও দাঈ হিসেবে গোটা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আল্লামা সাঈদী এক অনন্য

উপমা হয়ে থাকবেন। পাশাপাশি একজন সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁর অবদান ও ত্যাগের নজির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (ইফসু) শোকবার্তায় বলেন—

“আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ইন্তেকাল উম্মাহর জন্য অপূরণীয় এক ক্ষতি।”

প্রখ্যাত আলেম, ইতিহাসবিদ ও ইখওয়ান নেতা ড. আলী সাল্লাবি বলেছেন—

“আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করত। মানুষের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অসামান্য।”

বিশ্ববিখ্যাত দাঈ ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক বলেন—

“তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দাঈ। প্রথমে আদালত কর্তৃক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে রায় পরিবর্তন করে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক মুসলিম দেশই আছে, যেখানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে শুধু রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার-নিপীড়ন করা হয়।”

প্রখ্যাত মিশরীয় শিক্ষাবিদ, উসূলে ফিকহ ও মাকাসিদ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়াসফি আশুর বলেছেন—

“বুলবুলে কুরআন ও মুফাসসির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ইন্তেকালে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশি জনতার ক্ষতিতে আমরা শোকাহত।”

আমেরিকার প্রখ্যাত দাঈ ড. মুহাম্মাদ সালাহ বলেছেন—

“বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে ইসলাম প্রচারে তাঁর কনট্রিবিউশন অবিস্মরণীয়।”

ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের অন্যতম ফকিহ শাইখ ড. হাইসাম আল হাদ্দাস বলেছেন—

“আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকাল উম্মাহর জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য বড়ো ধরনের শূণ্যতা তৈরি করেছে।”

তুরস্কের নিউ রেফাহ পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট দুআন বেকিন বলেন—

“একটি বিতর্কিত বিচারিক প্রক্রিয়ায় কারাবরণ করা অবস্থায় আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ইন্তেকাল করেছেন।”

লিবিয়ার বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন আল ইহইয়া ওয়াত তাজ্জিদ সোসাইটির আমীর ড. সালেম আবু হানাক শোকবার্তায় বলেন—

“মানুষ প্রিয়জন এবং স্বজন হারালে ব্যথিত ও শোকাহত হয়। কিন্তু ইসলামের একজন প্রচারক ও মুজাহিদকে হারানোর কারণে একজন মুসলিমের বেদনা এর চাইতেও বেশি।”

ফিলিস্তিনের উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে শোকবার্তায় বলা হয়—

“আল্লামা সাঈদী বাংলাদেশের প্রখ্যাত দাঈ, খ্যাতিমান ওয়ায়েজ, অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। মুসলিম জনতার কাছে তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আমরা উলামা পরিষদ ফিলিস্তিন মুসলিম উম্মাহর প্রতি এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।”

ভারতীয় বিশিষ্ট আলেম সালমান নদভি বলেন—

“আল্লামা সাঈদীকে মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি মুফাসসির ও বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন। মহান আল্লাহ আপন রহমতে তাঁকে আবৃত করে রাখুন।”

ভারতের দেওবন্দের আলেম মাওলানা শওকত আলী অনলাইনে এক ভিডিও বার্তায় সাঈদী সাহেব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আল্লামা সাঈদীকে মুহাক্কিক আলেম এবং তাওহিদের একনিষ্ঠ খাদেম বলে উল্লেখ করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট আলিম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁদের শোকবার্তায় ব্যক্ত অভিমত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লামা সাঈদী শুধু বাংলাদেশের সম্পদই নন; বরং তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সম্পদ ছিলেন।

২৭. স্যোশাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশেও বর্বর হস্তক্ষেপ

আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পর ১৭ আগস্ট, ২০২৩ আমেরিকার মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের পিএইচডি গবেষক তানজিলুর রহমান ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাস দেন। যার কিছু অংশ এমন—

“সুখরঞ্জন বালিকে আমি সাঈদী সাহেবের মামলা চলাকালীন সময়ে ২০১৩-১৪ সালের দিকে ইউটিউব ভিডিওতে দেখেছি। একদম সহজ সরল গ্রামের কারও সাথেপাঁচে না থাকা স্বল্পশিক্ষিত মানুষ বোঝা যায় তাকে। অন্যদের মতো সুখরঞ্জন বালি সরকারি চাপে মিথ্যা সাক্ষ দিতে পারতেন, কিংবা কোনো কিছু না বলে চুপ থাকতে পারতেন। সেখানে এত রিস্ক নিয়ে সাঈদী সাহেবের পক্ষে সাক্ষ দিতে যাওয়ার হিম্মত তিনি কীভাবে দেখালেন, এটা আমাকে বরাবরই আশ্চর্য করে।

মার্টিন লুথার কিং, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা কিংবা ম্যালকম এক্স, এদের স্টাডি করতে গেলে আপনি একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য পাবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেরা ভুক্তভোগী হয়েই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বিখ্যাত হয়েছেন। নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কিংবা আরেক দেশের বা অন্য কোনো সমাজের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া এটা মানুষের নেচারের মধ্যে পড়ে না। এ জায়গায় সুখরঞ্জন বালির ভূমিকা আমার কাছে ইতিহাসের বিরল একটা ঘটনা বলে মনে হয়। তাকে আমি কোনো ছকেই ফেলতে বা বুঝতে পারি না। তিনি হিন্দু ধর্মালম্বী হওয়ার কারণে ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত।...

সুখরঞ্জন বালি কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে গেলে তাকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং তাকে

বাংলাদেশেও রাখার রিস্ক না নিয়ে একেবারে ভারত সীমান্তে বিএসএফের হাতে তুলে দিয়ে আসে। পরে কলকাতার দমদম কারাগারে তার বন্দি থাকার খবর নিয়ে বিবিসি বাংলা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।...এর পরে তার কোনো খবর আর মিডিয়ায় না আসায় দুর্ভাগা এক মানুষ হিসেবে তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুখরঞ্জন বালির কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। সাঈদী সাহেবের জানাযায় তাকে আবার দেখে আমি চমকে গিয়েছি। এত হেনস্তার স্বীকার হওয়ার পরেও সুখরঞ্জন বালি আবার ঘোষণা করে গেলেন যে, সাঈদী সাহেব তার ভাই বিসাবালির হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না। অথচ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বাঘা বাঘা লোকজনকে গুম থেকে ফিরে এসে চিমসে যেতে দেখেছি। ওই ট্রমা থেকে ফিরে এসে তারা কোনো মিডিয়ায় বা পাবলিকলি গুমের ঘটনা নিয়ে মুখ খোলার সাহস করেন না।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো—মিডিয়ার ভূমিকা। আমি গত তিন দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করছিলাম, এত বড়ো একটা ঘটনা মিডিয়া কীভাবে কভার করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো—এ ঘটনায় কোনো বড়ো পত্রিকায় নিউজ হয়নি, কোনো টেলিভিশন প্রতিবেদন করেনি। পিরোজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল পারেরহাটের সহজ সরল স্বল্পশিক্ষিত সুখরঞ্জন বালির হিম্মতের কাছে পুরো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আইন ও বিচার বিভাগ, পুলিশ ও মিডিয়া পরাজিত হলো। এত এত লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে বানানো যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং শাহবাগীদের লুন্ডি তিনি একাই খুলে দিলেন! ও হ্যাঁ, আরও একটা কাজ তিনি করেছেন। বিবেক, বোধ-বুদ্ধি কোথাও বন্ধক রেখে এসেছেন কি না, সেটা যাচাইয়ের সুযোগও আপনাকে করে দিয়েছেন।”

উপর্যুক্ত স্ট্যাটাস দেওয়ার একদিন পরই তানজিলুরের মা আনিছা সিদ্দিকাকে খুলনার খালিশপুর থানা পুলিশ তার মামার বাড়ি থেকে আটক করে। মাকে গ্রেফতারের পর ওইদিন অপর একটি স্ট্যাটাসে তানজিলুর উল্লেখ করেন—

“সাঈদী সাহেবের জানাযায় সুখরঞ্জন বালির উপস্থিতি নিয়ে আমার লেখাটা অনেক জায়গা থেকে শেয়ার হওয়ায় রোববার, ২০ আগস্ট খুলনার বয়রা এলাকার হাজী ফয়েজউদ্দীন সড়কে আমার

নানাবাড়িতে স্থানীয় যুবলীগ নেতারা পুলিশ নিয়ে এসে তাণ্ডব চালায় ও লুটপাট করে। আমার ছোটো মামা সিদ্দিক শহীদকে বেদম মারধর করে। আমার মা আনিছা সিদ্দিকা এগুলো সহ্য করতে না পেয়ে প্রতিবাদ জানানোয় তাকে খালিশপুর থানায় ধরে নিয়ে গেছে। দুইজন ভাড়াটিয়া এগিয়ে আসায় তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। ‘জি হুজুর’ শুনে অভ্যস্ত পুলিশ প্রতিবাদের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আমার মাকে সারারাত থানাহাজতে আটকে রেখে গোপন বৈঠকের অভিযোগে মামলা দিয়ে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে।”

আবেগঘন এ স্ট্যাটাসে পিএইচডি গবেষক তানজিলুর রহমান বলেন—

“আজ আমার মা গ্রেফতার হয়েছে, কাল আপনার মাকে ধরে নিয়ে যেতেও পুলিশ দুইবার ভাববে না। আজকে আমার মাকে খালিশপুর থানা থেকে যদি খুলনা কারাগারে যেতে হয়, এই লজ্জা বাংলাদেশে এখনও কোনো মানুষ যদি অবশিষ্ট থেকে থাকেন, তাদের সবার। আর যদি শুধু পা-চাটা দালালেরাই অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আমার প্রিয় জন্মভূমির কাছে আপাতত কোনো আবেদন নেই।”

শোক প্রকাশের কারণে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নেতাদের বহিষ্কার

আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে শুধু ইসলামী আদর্শকে ধারণকারী জনতাই শোকাহত হয়নি; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ লালনকারী অনেক মানুষও দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছে। তাদের অনেকে পদ-পদবি ও পারিপার্শ্বিকতার ভয়ে সেই দুঃখ গোপন করলেও কেউ কেউ প্রকাশ না করে পারেনি। আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করায় খোদ আওয়ামীলীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই তাদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে।

আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালে শোক প্রকাশসহ আক্ষেপ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দেওয়ায় ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৭ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্রলীগ। বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা রবিন খান খাদেম ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেন—‘আসসালামু আলাইকুম, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সবাই তাঁর রুহের মাগফিরাতের জন্য দুআ করবেন।’

ফেসবুকে কমেন্টের জেরে সাময়িক বহিষ্কার হয়েছেন গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলা ছাত্রলীগের ৬ নেতা। কাশিয়ানী উপজেলা ছাত্রলীগের উপ-সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক সোহাগ শরিফ ১৪ আগস্ট কমেন্টে লেখেন— ‘আমি একজন মুসলিম হিসেবে ছজুরের জন্য দুআ করি, আল্লাহ তাঁকে জাল্লাতুল ফেরদৌস নসিব করুক। এ কারণে যদি আমাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তবে করুক। আমি গর্বিত যে, আমি মুসলিম।’

বহিষ্কার নিয়ে নিজের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে সোহাগ শরিফ ফেসবুকে লেখেন— ‘এই কমেন্ট করার জন্য আমাকে কাশিয়ানী থানা ছাত্রলীগের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একজন মুসলিম হয়ে আরেক মুসলিম মারা গেলে তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ইন্না লিল্লাহ পড়া ও তাঁর জন্য দুআ করা কি অপরাধ? একটা কথা মনে রাখবেন, ধর্মের থেকে রাজনীতি বড়ো নয়।’

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি গাজী আমজাদ হোসেন ফেসবুক পোস্টে লেখে— ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রাজনীতি ও দলের বাইরে আল্লামা সাঈদী আমার প্রিয় একজন ইসলামিক বক্তা। যার ওয়াজ শুনে বড়ো হয়েছি।’ এই পোস্টের কারণে লোহাগাড়া উপজেলা ছাত্রলীগ গাজী আমজাদ হোসেনসহ তিন নেতাকে বহিষ্কার করে।

আল্লামা সাঈদীকে বেহেশতের মেহমান, কুরআনের পাখিসহ নানা ধরনের উপমা দিয়ে প্রশংসা করে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেওয়ায় নরসিংদীর ৬ ছাত্রলীগ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়। একই কারণে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকরামুল কবির দ্বীপকে এবং যশোর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মারুফ হোসেনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

যশোর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মারুফ হোসেন তার ফেসবুকে আল্লামা সাঈদীর ছবিসংবলিত সংবাদ কার্ড শেয়ার করেন। একইসঙ্গে তাঁর মাগফিরাত কামনা করেন। এ কারণে তাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

এভাবে ২২ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত শোক প্রকাশ ও ইতিবাচক মন্তব্য করায় ছাত্রলীগের অন্তত ২৫৩ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। তবে এ হিসাবও সম্পূর্ণ নয়; এর বাইরেও বহু ঘটনা ঘটেছে।

শুধু দলীয় কর্মী নয়, আল্লামা সাঈদীর জন্য দুআ ও মোনাজাত করার অপরাধে আলেম-উলামা ও মসজিদের ইমামগণও রেহাই পাননি। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইমাম হাফেজ মাওলানা ইলিয়াছ হোসেন ১৫ আগস্ট ফজরের নামাজ শেষে মসজিদে সকল মৃত মানুষের পাশাপাশি আল্লামা সাঈদীর নামেও দুআ করেন। এজন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়।

১৮ আগস্ট যশোরে উলাশী ইউনিয়নের গিলাপোল জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর আল্লামা সাঈদীর জন্য মোনাজাতে দুআ করায় আশরাফুল ইসলাম নামে এক ইমামকে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা। একই কারণে ফেনী সদর উপজেলার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সলিমুল্লাহকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন তাকে এক ছাত্রলীগ নেতা লাঞ্চিত করে। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অতি উৎসাহী সদস্যদের হাতে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন।

এত জুলুম-নির্যাতনের পরও আল্লামা সাঈদীর প্রতি মানুষের দুআ ও শোক প্রকাশ অব্যাহত ছিল। কেননা, দল থেকে বহিষ্কার, চাকরিচ্যুত ও শারীরিক নির্যাতন করে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কিন্তু তাদের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মুছে ফেলা যায় না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পিরোজপুরে দাফন করা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত মানুষ ছুটে আসে সেখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো— দেশের দূরদূরান্ত থেকে আসা শোকাহত জনগণ যাতে কবর জিয়ারত করতে না পারে, সেজন্য পুলিশ পাহারা বসানো হয়। পাহারারত পুলিশের হাতে হয়রানির শিকার হয় কবর জিয়ারতে আসা অসংখ্য মানুষ। একজন নিরপরাধ ও বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ১৩টি বছর কারাগারে বন্দি অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় করার পরেও তাঁর কবরের প্রতি এমন আচরণ অত্যন্ত ন্যাকারজনক।

সাধারণত মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু মুমিনগণ একে অপরকে ভালোবাসে আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য। রাসূল সা.-এর হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ব্যতীত মুসলমানের পারস্পরিক ভালোবাসা একটি ইবাদত এবং ঈমানের অংশ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَمَى عَزَى الْإِيمَانِ أَوْ تَقَى؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

“রাসূলুল্লাহ সা. (বিশিষ্ট সাহাবি) আবু যর গিফারি রা.-কে বলেন— ‘হে আবু যর, ইমানের কোন শাখাটি উত্তম?’ আবু যর রা. (আদবের সাথে) বললেন—‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।’ তখন রাসূল সা. বলেন—‘ইমানের সর্বোত্তম শাখা হলো আল্লাহর সম্বন্ধির জন্য সখ্যতা স্থাপন করা, আল্লাহর সম্বন্ধির জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর সম্বন্ধির জন্য কাউকে ঘৃণা করা।’” বায়হাকি : ৯৫১৩

আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক রা. বর্ণনা করেন—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْضِبُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَكَنِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وَجُوهَهُمْ لَتُورَى وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ :
إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“(একদিন সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে) রাসূলুল্লাহ সা. বললেন— ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের মর্যাদা এত বেশি হবে যে, তা দেখে নবী ও শহীদগণও ঈর্ষা করবেন।’ সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?’ নবীজি বললেন—‘তারা এমন শ্রেণি, যারা আল্লাহর সম্বন্ধির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালোবেসেছে; অথচ তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই, আর্থিক লেনাদেনারও কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর শপথ! (কিয়ামতের দিন) তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবে নূরের আসনে। (সেদিন) মানুষ

যখন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, তখনও তারা ভীত থাকবে না।’ অতঃপর রাসূল সা. কুরআনের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—‘জেনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাশ্রস্ত হবে না।’” আবু দাউদ : ৩৫২৯

আল্লামা সাঈদীর প্রতি দল-মত নির্বিশেষে মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ছিল কুরআনের কারণে এবং আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাই আল্লাহ তায়ালা উনাকে দেশে-বিদেশে অনেক সম্মানিত করেছেন, যা তাঁর ইত্তেকালের পর আরও বেশি প্রকাশ পেয়েছে। আল্লামা সাঈদীর প্রতি মানুষের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ওনার প্রতি আল্লাহ তায়ালায় রহমতের নমুনা বলা যায়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأُحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ
جِبْرِيلُ فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأُحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ
أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ .

“আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি (ফেরেশতাদের সর্দার) জিবরাইল আ.-কে ডেকে বলেন—‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাসো।’ তখন জিবরাইল আ.-ও ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন এবং তিনি আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন—‘আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালোবাসো।’ তখন আকাশের অধিবাসীরা ওই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।” বুখারি : ২৯৬৯

২৮. আল্লামা সাঈদীর অবদান

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ক্রান্তিকালে ১৯৪০ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার পিরোজপুরে জন্ম নিয়েছিলেন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। সেদিনের প্রত্যন্ত গ্রামের সেই শিশুটিই নিজের প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও ইখলাসের মাধ্যমে সাকল্যের চূড়ায় উঠেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের কিংবদন্তি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.)। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন একজন বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুফাসসিরে কুরআন, দাঈ ইলাল্লাহ ও কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথিকৃৎ।

আল্লামা সাঈদী দীর্ঘ সময় ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে জ্ঞানের জগতে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসির উপস্থাপন এবং অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করে তিনি দেশে-বিদেশে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন। ওনার পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯১ সালে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা তাঁকে ‘আল্লামা’ উপাধিতে ভূষিত করে।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) মহগ্রন্থ আল কুরআনকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অত্যন্ত সুন্দর, সহজ ও সাবলীল ভাষায় পৌঁছে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশে রাষ্ট্র, সমাজ-সংস্কৃতি ও ইসলামী দাওয়াহর ময়দানে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। তাঁর অবদানের পরিধি ব্যাপক হলেও এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

বাংলাদেশে তাফসির মাহফিলের সূচনা ও প্রসার

তথ্যসূত্রে জানা যায়, ১৯৪০ সালে বাংলাদেশে প্রথম তাফসির মাহফিলের সূচনা করেছিলেন মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে এসে রেঙ্গুনে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি

ঢাকায় আসেন এবং চকবাজার এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তিনি চকবাজার জামে মসজিদে কুরআনের তাফসির করতেন। মসজিদের বাইরে ঢাকায় তাফসির মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মা'ছুম। এরপর একসময় আল্লামা সাঈদী তাফসির মাহফিলকে মাঠে-ময়দানে নিয়ে আসেন এবং দেশের প্রতিটি নগর ও গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেন—

“১৯৭৩ সালে ঢাকার আর্ম্যানিটোলা মাঠে মুফতি দ্বীন মোহাম্মদ খানের সভাপতিত্বে একটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেই মাহফিলে যুবকবয়সি মাওলানা সাঈদীও উপস্থিত ছিলেন। জনাব আব্দুস সালাম রাজা (একটি প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা) ছিলেন মুফতি দ্বীন মোহাম্মদ খান সাহেবের খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। মাহফিলের একপর্যায়ে তিনি মুফতি সাহেবকে বললেন, ‘খুলনা থেকে একজন ভালো ওয়ায়েজ মাহফিলে এসেছেন। ওনাকে কি মাহফিলে একটু সময় দেওয়া যায়?’ এ কথা মুফতি সাহেবের কাছে উপস্থাপন করা হলে তিনি মাওলানা সাঈদীকে বিশ মিনিট বক্তৃতা করার অনুমতি দেন। মাওলানা সাঈদী স্টেজে উঠে মাইকের সামনে কথা বলতে শুরু করলেন ওনার স্বভাবসুলভ রীতিতে। যখন তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শুরু করেন, তখন মাহফিলের চতুর্দিকে পিনপতন নিরবতা নেমে আসে। দীর্ঘক্ষণ মাহফিল চলার কারণে শ্রোতাদের মধ্যে যে অবসাদ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছিল তা মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লামা সাঈদীর ওয়াজের বিশ মিনিট পার হয়ে গেলে মাহফিলের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এক ব্যক্তি মুফতি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ‘হজুর, ওনার সময় শেষ হয়ে গেছে।’ জবাবে মুফতি সাহেব বললেন, ‘ওনাকে বলতে দাও।’ চল্লিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ওই ব্যক্তি পুনরায় মুফতি সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘হজুর, চল্লিশ মিনিট ধরে একজন অনির্ধারিত আলোচক বক্তব্য রেখে চলেছেন।’ তখন মুফতি সাহেব বললেন, ‘খামোস। তুম সামঝাতা নেহি, ইয়ে মাহফিল সাঈদী ক্যা হয়।’ এরপর মাওলানা সাঈদী তিন-চার মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করেন।”

সেদিন হতে আল্লামা সাঈদীর আঞ্চলিক বক্তা থেকে জাতীয় পর্যায়ে বক্তা হিসেবে পথচলার সূচনা হয়। আল্লামা সাঈদী বাংলাদেশে কুরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন এবং অতি সাধারণ মানুষের কাছে তা উপস্থাপন শুরু করেন। এর ধারাবাহিকতায় কুরআনের তাফসির মাহফিল ইসলামী দাওয়াহর ময়দানে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এক্ষেত্রে আল্লামা সাঈদীর অবদান অনস্বীকার্য।

ইসলাম প্রচারে নতুন ধারার প্রবর্তন

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আল্লামা সাঈদী একটি নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন। এ দেশে একসময় ওয়াজ মাহফিলগুলোর বেশিরভাগই ছিল কিচ্ছা-কাহিনিনির্ভর। ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমেও যে সাধারণ মানুষকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, ইবাদত, ঈমান-আকিদা ও ইসলামের শিক্ষাসমূহ শেখানো যায়, তা আল্লামা সাঈদী (রাহি.) দেখিয়ে গেছেন। আল্লামা সাঈদীকে অনুসরণ করে অনেক ওয়ায়েজ ও মুফাসসিরে কুরআন তৈরি হয়েছেন এবং তাঁরা দেশ-বিদেশে দাওয়াতের ময়দানে ভূমিকা পালন করছেন।

কুরআনকে সহজভাবে মানুষের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে আমলের আগ্রহ সঞ্চার করে উপস্থাপন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আল্লামা সাঈদীর যোগ্যতা অতুলনীয়। ওই সময় তথ্যপ্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া না থাকার পরও সুমধুর সুরে তিলাওয়াত, সুন্দর উপস্থাপন কৌশল ও সারগর্ভ জ্ঞানের আকর্ষণে তাঁর ওয়াজ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল। তিনি শিরক, বিদআত, পীরপূজা ও কবরপূজার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়ে মানুষকে তাওহিদমুখী করেছেন। ইসলামকে মানুষের অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেছেন। আর তাঁর এ সকল ব্যাখ্যা ইসলামের নির্ঘাস থেকে উৎসারিত হওয়ার কারণে তিনি মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য শুনে দল-মত নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও যুবসমাজ সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, দেশে-বিদেশে অসংখ্য অমুসলিমও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সুমধুর তিলাওয়াত ও অনবদ্য তাফসিরের প্রভাব

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাহী। তাঁর সুললিত কণ্ঠে সাবলীল ভাষায় কুরআনের অনবদ্য ব্যাখ্যা সর্বস্তরের মানুষকে চুম্বকের

মতো আকর্ষণ করত। সুন্দর শব্দ চয়ন ও বাক্যবিন্যাস, বর্ণনামূল্যবোধ চমৎকারিত্ব ও ঘটনার পর ঘটনা মানুষকে বিমোহিত করে রাখার এক জাদুকরী যোগ্যতা তাঁর মধ্যে ছিল। এসব নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে বড়ো নিয়ামত।

আল্লামা সাঈদীর (রাহি.) কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনলেই স্পষ্ট বোঝা যেত কার কণ্ঠ বেজে উঠেছে। তখন মানুষ তন্ময় হয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনত। সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতের রয়েছে অনন্য ফজিলত; আর আল্লাহ তায়ালা সেই ফজল ও করম আল্লামা সাঈদীকে দান করেছিলেন।

মদিনার আনসার সাহাবি উসাইদ ইবনে হুদাইর রা. মনোমুগ্ধকর সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর এবং কুরআন তিলাওয়াতে ছিল বিশেষ আকর্ষণ। ফেরেশতারা পর্যন্ত তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্য ভিড় জমাতেন। এক রাতে তিনি তিলাওয়াত করছিলেন, হঠাৎ তাঁর অদূরে বেঁধে রাখা ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করল। এর কাছাকাছি ছিল তাঁর শিশুপুত্র ইয়াহইয়া। উসাইদ রা. আশঙ্কা করলেন, ঘোড়াটা লাফিয়ে না জানি ইয়াহইয়ার গায়ে পড়ে। তাই তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে ইয়াহইয়াকে সরাতে গেলেন। এমন সময় ওপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, মেঘখণ্ডের মতো কিছু, যাতে আছে অসংখ্য বাতি। সকালে উসাইদ রা. রাসূল সা.-কে ঘটনাটি অবহিত করেন। তখন নবীজি মন্তব্য করেন—

تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ. وَلَوْ قَرَأْتَ لَأُصْبِحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا. لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

“তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা! তোমার তিলাওয়াত শোনার জন্য তাঁরা (আকাশ থেকে) নেমে এসেছেন। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে, তবে এ ফেরেশতারাও সকাল পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করতেন। এমনকি অন্য লোকেরাও তাদের দেখতে পেত।”

বুখারি : ৫০১৮, মুসলিম : ৭৯৬

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) মক্কা, মদিনা, আল আযহার, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ বা মালয়েশিয়ার বড়ো-প্রসিদ্ধ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেননি।

কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক বয়ান, শৈল্পিক উপস্থাপনা ও কথার সাবলীলতা বিশ্বের বড়ো বড়ো ডিগ্রিধারীদেরও ছাড়িয়ে গেছে। একজন মানুষের বক্তৃতা শোনার জন্য লাখো মানুষ মাহফিলে ছুটে আসেন, এই এক অনুপম দৃশ্য। আল্লামা সাঈদীর বক্তৃতার আরেকটি অনন্য দিক হচ্ছে—তাতে একই সাথে সমন্বয় ঘটেছিল সাবলীলতা, সহজবোধ্যতা, রুচিশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকতার মতো পরস্পর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের। তাই আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য শুনে একই সাথে বিচারক, প্রশাসক, প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলিম-অমুসলিম, শ্রমিকজনতাসহ সকল শ্রেণির মানুষ উপকৃত হয়েছে।

আল্লামা সাঈদী রাহি. তেমনই একজন দাঈ ইলাল্লাহ ছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত সেই আয়াতটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়াল্লা বলেছেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٢﴾

“তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে ডাকে আল্লাহর দিকে, সৎকাজ করে এবং (সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে) ঘোষণা দেয়—অবশ্যই আমি মুসলিমদের একজন?” সূরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩৩

উপর্যুক্ত আয়াতটি তৎকালীন মক্কার কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে যারা ঈমানের ওপর দৃঢ় থেকে সততা ও সাহসিকতার সাথে দাওয়াতি কাজ করতেন, তাদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। কুরআনে বর্ণিত দাঈ ইলাল্লাহর এই বৈশিষ্ট্য আল্লামা সাঈদী সুন্দর ও দৃঢ়তার সাথে ধারণ করেছিলেন। সুদৃঢ় ঈমান, উন্নত আমলের পাশাপাশি আল্লামা সাঈদী ছিলেন নির্ভীক সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ। বাংলাদেশে দাওয়াতে দ্বীনের ময়দানে উনার মতো সাহসী আলেম আর দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। প্রতিকূল পরিবেশে কঠিন বিপদের সময় তিনি ছিলেন সিংহের মতো দুঃসাহসী। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বাধা-প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে মাহফিল করেছেন। ইসলামবিরোধী শক্তির ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি ও হামলা উনার কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারেনি।

মানবতার সেবার মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ

আল্লামা সাঈদী একজন দাঈর পাশাপাশি একজন জনদরদী নেতা ছিলেন। তিনি সব সময় মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াতেন। ওনার নির্বাচনী এলাকার দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি সেবা দিয়েছেন। দরিদ্র, দুস্থ, এতিম, মিসকিন, বিধবাদের সর্বদা সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাদের কষ্ট লাঘবে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও হতদরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন করেছেন। তিনি যখনই নিজের গ্রামের বাড়িতে যেতেন, তখনই তাঁর নিয়মিত কর্মসূচিতে থাকত দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানো। মানুষের দুনিয়ার কষ্ট লাঘবে সেবার মাধ্যমে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা লাভ করতেন তিনি এবং এরপর হিকমতের সাথে তাদের আখিরাতের কষ্ট লাঘবের জন্য নসিহত করতেন।

একজন দাঈ ইল্লাল্লাহ হিসেবে তিনি আল্লাহর রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ করে সেবার মাধ্যমে মানুষকে স্বীনের দাওয়াত প্রদান করতেন। রাসূল সা.-এর হাদিসে মানুষের সেবা করাকে ঈমানের নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মানবসেবা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই।

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ .

“ঈমানের সত্তর বা ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)—এর ঘোষণা দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা হলো ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।” মুসলিম : ৬০

এ হাদিসের শিক্ষা হলো—মানুষের উপকার অতি ক্ষুদ্র হোক বা বড়ো হোক সেটা ঈমানি কাজ।

মানবতার সেবা রাসূল সা.-এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন—

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ
الصَّائِمِ النَّهَارِ.

“বিধবা ও মিসকিনের কল্যাণে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো অথবা ওই ব্যক্তির মতো যিনি রাতে সালাত আদায় করেন এবং দিনে রোজা রাখেন।” বুখারি : ৫৩৫৩

অতএব, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, রাত জেগে সালাত আদায় করা এবং দিনে রোজা রাখা যেমন ইবাদত, তেমনি অসহায়-নিরন্ন মানুষের সেবা করাও একটি ইবাদত।

অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) কুরআনের তাফসির মাহফিলের পাশাপাশি আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্বপালনে রাজপথে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে মশাল টাওয়ার নির্মাণ করা হলে অগ্নিপূজার বিরুদ্ধে তিনি ফুঁসে ওঠেন এবং তাওহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে প্রবল আন্দোলনের সূচনা করেন। তৎকালীন সরকার এ আন্দোলনে ভীত হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে মশাল টাওয়ার ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়।

১৯৮৮ সালে রাজধানী ঢাকার মোড়ে মোড়ে সরকার ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিল। আল্লামা সাঈদী মূর্তিপূজার এই নব্য সংস্করণের বিরুদ্ধে তাওহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং জনতার বিশাল মিছিল নিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাছে মূর্তি অপসারণের জন্য স্মারকলিপি পেশ করেন। আল্লামা সাঈদীর এ প্রতিবাদী ভূমিকার কারণে তৎকালীন সরকার সেই রাতেই অভিশপ্ত মূর্তি অপসারণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৮৯ সালের মে মাসে বিতর্কিত লেখক সালমান রুশদি রাসূল সা. ও ইসলাম ধর্মকে উপহাস করে স্যাটানিক ভার্সেস নামে বই প্রকাশ করলে আল্লামা সাঈদী এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং দেশবরেণ্য আলেমদের সাথে নিয়ে সারা দেশে হরতালের ডাক দেন। আল্লামা সাঈদীর নেতৃত্বে আলেমসমাজের ডাকে সেদিন বাংলাদেশে অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন

হরতাল এর আগে আর কখনও পালিত হয়েছে বলে জানা যায় না। তরুণ-যুবকরা কাফনের কাপড় পরে এ হরতালে যোগ দিয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ‘হ্যালোইন নাইট’ নামে এক জংলি রাতের আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ রাতে মদপান, জোড়ায় জোড়ায় যুগলদের নাচ ইত্যাদি অশ্লীল উৎসবের বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদী আদালতে মামলা করেন। এর ফলে আদালত থেকে উক্ত উৎসবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে তাদের সকল নোংরা আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়।

ইসলামে অশ্লীল গানবাজনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বামপন্থিরা ‘কোন কিতাবে লেখা আছে হারাম বাজনা গান’ নামে একটি গান রচনা ও পরিবেশন করে। ইসলামবিরোধী শক্তির রচিত এ গানের বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদী আদালতে মামলা করেন। আদালত আল্লামা সাঈদীর রিটের শুনানি শেষে ইসলামবিরোধী গানটি নিষিদ্ধ করে।

এ রকম আরও অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা যায়, যা আল্লামা সাঈদীর নাহি আনিল মুনকারের বলিষ্ঠ ও সফল দায়িত্বপালনের অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ইসলামবিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদী ছিলেন এক লড়াই সেনাপতি। তাঁর নেতৃত্বে এ দেশের তাওহিদি জনতা রুখে দিয়েছিল অসংখ্য ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা।

ইসলামী রাজনীতির বিকাশে আল্লামা সাঈদী

ইসলামী রাজনীতির বিকাশে আল্লামা সাঈদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ‘ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়; বরং একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা’—তিনি এ ধারণা মানুষের মাঝে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত খণ্ডিত ধারণা পরিহার করে আল কুরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে शामिल হয়েছে। ইসলামী রাজনীতিকে সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গন থেকে ময়দানের বাস্তবতায় পরিণত করতে যেসকল রাজনীতিবিদ অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন, আল্লামা সাঈদী (রাহি.) ছিলেন তাদের অন্যতম।

মানবরচিত ধর্মহীন মতবাদ সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদী জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যে একটি কুফরি মতবাদ, তা তিনি দলিল-প্রমাণ দিয়ে নিজ বয়ানে তুলে ধরেছেন। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা জাতি আজীবন স্মরণ রাখবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা অনন্য। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদী (রাহি.) ছিলেন সব সময় সোচ্চারকণ্ঠ। এমন কোনো মাহফিল ছিল না, যেখানে তিনি ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেননি।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে অবদান

আল্লামা সাঈদী বাংলাদেশকে একটি ইসলামী আদর্শভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হন এবং পর্যায়ক্রমে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেন। জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরপর দুবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন করেছেন। তিনি জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নসহ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি জাতীয় সংসদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় সংসদ সদস্যদের মাথা ঝাঁকানোর দীর্ঘদিনের প্রচলিত শিরকি প্রথা বাতিলের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও আলিয়া মাদরাসার ফাজিলকে ডিগ্রি, কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান এবং কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে গ্র্যাজুয়েশনের সমমান ডিগ্রির স্বীকৃতি আদায়ে ভূমিকা রেখেছেন।

ইসলামী অর্থনীতির প্রসার

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার প্রসারে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার বিকাশ ও জনপ্রিয়তা অর্জনের পেছনে আল্লামা সাঈদীর রয়েছে অনবদ্য ভূমিকা। ইসলামী ব্যাংক যেন শরিয়াহর ধারায় পরিচালিত হয়, সেজন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তাকসির মাহফিল ও ইসলামী ব্যাংকের নতুন ব্রাঞ্চ উদ্বোধন অথবা ব্যাংকের যেকোনো প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে আল্লামা সাঈদী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিষয়ে আলোচনা রাখতেন। সে সময় ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আব্দুল জব্বার (রাহি.)। শরিয়াহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মুফতি আব্দুর রহমান ও মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলীর মতো ব্যক্তিবর্গ। আল্লামা সাঈদীও সে শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তৎকালীন শরিয়াহ বোর্ডের সদস্যদের ভূমিকার কারণেই সারা বিশ্বে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেদের লভ্যাংশ কমিয়ে দিয়ে হলেও ইসলামী ব্যাংককে শতভাগ শরিয়াহভিত্তিতে পরিচালিত করে হালাল রুজি-রোজগারের পরামর্শ দিতেন। এর পেছনে আল্লামা সাঈদীর অবদান ছিল অতুলনীয়।

উম্মাহর সংকট নিরসন ও ঐক্যপ্রচেষ্টায় ভূমিকা পালন

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) ছিলেন একজন উম্মাহদরদি আলেম ও রাজনীতিবিদ। বিশ্বব্যাপী উম্মাহর নানামুখী সংকটে তিনি পেরেশান হতেন। সেগুলো নিয়ে কথা বলতেন, বাংলাভাষী মুসলিমদের সচেতন করতেন। সাধারণ মানুষের পর্যায় পর্যন্ত উম্মাহচেতনা সৃষ্টিতে আল্লামা সাঈদীর ছিল অনন্য অবদান।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল মত ও পথের পীর ও উলামায়ে কেরামদের সাথে মতবিনিময়সহ বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি রক্ষা ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংকট নিরসনে অবদান রেখেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের ৫২টি দেশে সফর করেছেন।

১৯৯১ সালে সৌদি বাদশাহর আমন্ত্রণে কুয়েত ও ইরাক যুদ্ধের মীমাংসা বৈঠকে যোগদান করেন আল্লামা সাঈদী।

১৯৯৩ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে ‘ওয়ার্ল্ড মুসলিম প্যারেড ডে’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন। সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চারশত ইসলামিক স্কলার ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আল্লামা সাঈদীকে ‘গ্র্যান্ড মার্শাল’ পদক প্রদান করা হয়েছিল।

২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের আমন্ত্রণে দুবাইয়ে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রোতার সামনে তিনি কুরআনের তাফসির পেশ করেন। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কাবা শরিফের সম্মানিত ইমাম শাইখ আবদুর রহমান আস সুদাইসের সাথে আল্লামা সাঈদীও আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়া তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদ নির্মাণসহ ইংল্যান্ডে ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

উম্মাহর প্রয়োজনে এবং মুসলিম শক্তিসমূহের ঐক্যের প্রয়াসে আল্লামা সাঈদী আজীবন কাজ করেছেন। দেশে-বিদেশে যারাই ইসলামের পুনর্জাগরণে কাজ করছেন, তাদের স্বীকৃতি প্রদানে ও সহযোগিতা করতে আল্লামা সাঈদী কখনোই কার্পণ্য করেননি। তিনি সকলের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সকলের সাথেই ছিল তাঁর হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক। এসব অবদানের জন্য তিনি মুসলিম উম্মাহর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পরিশেষে...

আব্দুলামা সাঈদী (রাহি.) ছিলেন অনন্য ও বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী বিশাল এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে একজন প্রাজ্ঞ আলেম, নন্দিত মুফাসসিরে কুরআন, মুখলিস দাঈ ইলাহুয়াহ, জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ, সমাজসংস্কারক ও ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা।

আব্দুলামা সাঈদী ইকামতে দ্বীনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কুরআনের তাফসির মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। ইসলামী দাওয়াহর ময়দানে রেখে গেছেন অনেক অনুসরণীয় উপকরণ ও জ্ঞানভান্ডার। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাতারে থেকে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর মধ্যে জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের তামান্না ছিল প্রবল। আজীবন তিনি বাংলাদেশের এই সবুজ ভূখণ্ডে আল কুরআনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে গেছেন। এই কাজে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। দীর্ঘ বন্দিজীবন অতিবাহিত করেছেন। জুলুম-নির্যাতনের পাহাড়সম বাধার সামনেও তিনি নত হননি। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর হৃদয় উৎসারিত ও অকৃত্রিম প্রার্থনা। প্রায় প্রতিটি মাহফিলে তিনি শাহাদাতের মউত প্রত্যাশা করে দুআ করতেন।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

“যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে শাহাদাতের তামান্না করেন, আব্দুলাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেন; যদিও তিনি বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন।” মুসলিম : ৪৭৭৭

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) দীর্ঘ সময় জালিমের কারাগারে বন্দি অবস্থায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হাসপাতালে নীত হয়ে ইস্তেকাল করেছেন। তিলে তিলে তাঁর জীবনশক্তিকে নিঃশেষ করেছে জালিমরা। কিন্তু তাঁর ইমানিয়াতের উজ্জ্বল হাসিকে তারা স্তান করতে পারেনি। তাঁর এই মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু, ইনশাআল্লাহ। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেও রাসূল সা.-এর হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী শাহাদাতের আকূল তামান্নার বদৌলতে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে অসীম মর্যাদাপূর্ণ ও মৃত্যুহীন জীবন লাভ করেছেন, ইনশাআল্লাহ। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে বলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُزْزِقُونَ ﴿١٧٩﴾

“যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদের তোমরা মৃত বলো না।
বরং তারা জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত।” সূরা
আলে ইমরান : ১৬৯

অগণন মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া চিন্তা, কর্ম, ইলমে জারিয়া, দাওয়াতে জারিয়া চলমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ। তিনি বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়।

দাওয়াতের ময়দানে আল্লামা সাঈদী রেখে গেছেন অসংখ্য উপকরণ। তাঁর অসংখ্য মাহফিলের ধারণকৃত কুরআনের তাফসির, সিরাতের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অডিও-ভিডিও ডকুমেন্টারি অনলাইনে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন বইপুস্তক ও তাফসিরগ্রন্থ মজুত আছে। তাঁর এই জ্ঞানভান্ডার দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, শহর, নগর, বন্দর, হাট-বাজার, দোকানপাট, মসজিদ-মাদরাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এই বিশাল ইলমি আমানতকে অনাগত প্রজন্মের কাছেও পৌছানোর ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এই অনন্য দাওয়াতি উপকরণের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি আল্লামা সাঈদী আজ অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া দাওয়াতি উপকরণগুলো যুগ যুগ ধরে তরুণ প্রজন্মসহ সর্বস্তরের মানুষ ইসলামকে জানার সুযোগ পাবে। জীবন গড়ার পাথেয় হিসেবে আমাদের অনাদিকাল পথ দেখাবে।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের দায়িত্ব হলো—বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লামা সাঈদীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ইকামতে দ্বীনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। আল্লামা সাঈদী (রাহি.) ময়দানের প্রতিকূল অবস্থা দেখে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য থেকে কখনোই পিছু হটেননি। আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামবিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র, জুলুম-নির্যাতন ও তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রেখে ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ-কুরবানি এবং যোগ্যতার সাথে আমরা ময়দানে ভূমিকা রাখতে পারলে শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না, ইনশাআল্লাহ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়—

ত্বী-পুত্রের আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক

হেসে কুরবানী দিত প্রাণ হয়!

আজ তারা মাগে ভিখ

কোথা সে শিক্ষা—আল্লাহ ছাড়া

ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা

আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে ল'য়ে কোরআন'।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জমিনে শহীদের রক্ত ঝরেছে, সেটি ইসলামী আন্দোলনের জন্য উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমাদের শহীদ নেতৃবৃন্দের রক্তের বিনিময়ে এ দেশে লাখো অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা একেএম ইউসুফ, মাওলানা আবদুস সোবহান, আল্লামা সাঈদী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, আবদুল কাদের মোল্লা, মীর কাসেম আলী ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের জন্ম হবে, ইনশাআল্লাহ। আসুন, আল্লামা সাঈদীসহ শহীদ নেতৃবৃন্দের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে কুরআনের দাওয়াত ও কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃঢ়প্রত্যয়ে এগিয়ে যাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন, আমিন!

লেখক পরিচিতি

এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ

সংগঠক ও সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার বাসিন্দা। জন্ম ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর।

শিক্ষাগত জীবনে মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্তির পাশাপাশি তিনি ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং ১৯৮৯ সালে মাস্টার্স করেন। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষক হিসেবে গবেষণারত আছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই হামিদুর রহমান আযাদ রাজনীতিতে ছিলেন সরব। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগ দেন তিনি। পর্যায়ক্রমে তিনি ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি, ঢাকা মহানগরী সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৫ সালের শেষ দিকে হামিদুর রহমান আযাদ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর অবিভক্ত ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি ও নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বাকী অংশ পরের ফ্লাপে

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে হামিদুর রহমান আযাদ অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সাংসদের পাশাপাশি তিনি নবম জাতীয় সংসদে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

হামিদুর রহমান আযাদ ছাত্রজীবন থেকে নিয়মিত লেখালিখি করে আসছেন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে দুঃশাসনের পঁচিশ বছর, আমাদের দাওয়াত ও গণভিত্তি রচনা, আল্লামা সাঈদী (রাহি.): একটি সোনালি ইতিহাস। প্রকাশিতব্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে—উপমহাদেশের রাজনীতিতে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা, বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর অবদান, উপকূলবাসীর উন্নয়ন ভাবনা, দাওয়াতে দ্বীনের নান্দনিকতা ও কর্মকৌশল, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে গণভিত্তি রচনার পদ্ধতি, দ্বীনের পথে ত্যাগ-কুরবানি, ইসলামী পুনর্জাগরণ যুগে-যুগে ও দেশে-দেশে, চার দেয়ালের কান্না প্রভৃতি।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রাহি.) ছিলেন এক অনন্য মানুষ, অনুপম ব্যক্তিত্ব। দ্বীনের সমবা ও যথোপযুক্ত উপস্থাপনে তিনি ছিলেন অনন্য। আদর্শের প্রতি কমিটমেন্টে তিনি ছিলেন প্রথম কাতারের সেনাপতি। সাহস, ত্যাগ-কুরবানি, ব্যক্তিত্ব ও রুচিশীলতায় তিনি অগ্রগামীদের অন্যতম। এককথায় বাংলার জমিনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ দাঈ ইলাল্লাহ, সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, প্রাথসর সংগঠক ও জননন্দিত জননেতা।

আল্লামা সাঈদী (রাহি.) যে অপরিমেয় প্রেরণা, আদর্শ, ত্যাগ-কুরবানি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সে ঋণ অপরিশোধযোগ্য। তাঁকে যথার্থভাবে স্মরণ, অনুসরণ ও দুআর মাধ্যমেই কেবল সেই ঋণের সহস্রভাগের একভাগ বা তারও কম হয়তো ঘুচতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যয় হোক-আল্লামা সাঈদীর জীবন, কর্ম ও আদর্শের বার্তাকে আমরা ছড়িয়ে দেবো সবুজ বাংলাদেশে।

